নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মাটির দেবতা

গ্রন্থপীঠ
২০৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : ২৩শে ফাল্গুন, দোলপূর্ণিমা ১৩৭২ ।

প্রকাশক : কোরক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থপীঠ ২০৯ কর্ণোয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬ ।
মুদ্রাকর : ধনঞ্জয় রায় মুদ্রণশ্রী প্রেস ১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন কলিকাতা ৬ ।
প্রচ্ছদ ব্লক : রয়েল হাফটোন কোম্পানী ৪ সরকার বাই লেন কলিকাতা ৭ ।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : শ্রীকালী আর্ট প্রেস ২০৯সি কর্ণোয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬ ।

প্রচ্ছদশিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

॥ এক ॥

তোমার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিনটির কথা তোমার মনে আছে কিনা জানি না।

অবশ্য, তোমার মনে থাকবার কথাও নয়। কলেজের দু-আড়াই হাজার ছেলেমেয়ের ওপরে ওঠবার বড়ো সিঁড়িটার মুখে তোমরা দু-জন দু ধারে দাঁড়িয়ে ছিলে, তুমি আর অসীম—অসীম চৌধুরী। তোমাদের হাতে ছিল ফুটো করা চাঁদার বাক্স, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলে, আমাদের ইউনিয়নকে সাহায্য করুন।

কেউ দিচ্ছিল, কেউ বা চলে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। আমিও চলে যেতে পারতুম, কিংবা হাতে এক আনা দু আনা যা ওঠে, তাই ব্যাগ থেকে বের করে ফেলে দিতে পারতুম তোমার বাক্সে। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি এল, ফস করে বলে বসলুম, আমি দেব না।

তুমি বললে, আপনার খুশি। কিন্তু কেন দেবেন না?

—আপনাদের ইউনিয়ান পলিটিক্‌স্ করে। আমি কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই।

যেন ঘুমন্ত বাঘের গায়ে খোঁচা দিয়েছি, এম্‌নিভাবে জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল তোমার চোখ। তখন তুমি দাড়ি রাখতে, ঝাঁকড়া চুলে তেল দিতে না, সব মিলিয়ে কী একটা হিংস্র পৌরুষের রূপ দেখলুম তোমার ভেতরে!

তুমি বললে, মাপ করবেন। এ যুগের মেয়ে হয়েও যে আপনি সত্য যুগের মধ্যে বাস করছেন তা জানতুম না।

আমার রোখ চাপল। যে মফঃস্বল শহরের কলেজ থেকে আই-এ

পাশ করে এখানে অনার্স পড়তে এসেছি, সেখানে পরপর দু-বার আমি ডিবেটে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলুম। তীব্রস্বরে বললুম, আমার কাছে এডুকেশন—এডুকেশন ছাড়া কিছু নয়। যারা কলেজকে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটির সেণ্টার বলে ভাবতে চায়, তাদের কাছ থেকে আধুনিকতার সার্টিফিকেট না হলেও আমার চলবে।

তুমি বললে, তা চলবে। কারণ, ফসিলের কাছে সময়ের কোনো হিসেব নেই।

আমি জ্বলে উঠে আরো কী বলতে যাচ্ছিলুম, পাশ থেকে ক্লাস ফ্রেণ্ড মীরা মিত্র আমার হাত ধরে টানল। বললে, আঃ, কী হচ্ছে কৃষ্ণা! কী হবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে? চল—চল—

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলুম। পেছন থেকে কানে এল তোমার হাসির শব্দ। আর একবারের জন্যে আমার পা যেন থেমে এল।

তোমার ওই হাসিটা তারপর অনেকবার আমি শুনেছি। তীব্র ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ভরা অদ্ভুত হাসি। শুনলে ভয় করে—মনে হয় তর্ক করে যদি বা জিততে পারি, তোমার ওই হাসির সামনে কোনদিন আমি দাঁড়াতে পারব না। ঈশ্বর আমি মানিনা, তুমিও নও; তবু এর পরে বহুদিন আমি ভেবেছি, তোমার জন্মের সময় বিধাতা তাঁর সব চাইতে কঠিন ব্যঙ্গের হাসিটি তোমার মুখে ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন—ওই হাসির জোরেই তুমি বিশ্ব জয় করতে পারো।

আর মা-বাবা বুঝেই তোমার নাম রেখেছিলেন—বিশ্বজিৎ।

ক্লাসে এলুম, তোমার কথাটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারলুম না। এর ভেতরে কলেজে নিশ্চয় তো[illegible] দেখে থাকব, কারণ না-দেখার মতো তুমি নও। তোমার অস্তি[illegible] এত প্রখর, এমন প্রবল যে তুমি নিজে সে-কথা ভুলতে পারো [illegible] ভুলতেও দাও না! তবু আমি তোমায় লক্ষ্য করিনি। তার [illegible] আমি মফঃস্বল থেকে

পড়তে এসোছলুম ভালো রেজাল্ট করবার জন্যে। আমার অনার্স ক্লাসের বাইরে আর কোথাও যে কিছু আছে তা আমি জানতুম না, জানতে চাইওনি।

তবু সেদিন ক্লাসে লেকচারে কিছুতেই ভালো করে মন দিতে পারলুম না। এক সময় ফিসফিস করে মীরাকে জিজ্ঞেস করলুম, ওই ছেলেটা কে রে ?

—কোন্ ছেলেটা ?

- আরে ওই যে দাড়িওলা, ঝাঁকড়াচুলো—চাঁদা নিয়ে ঝগড়া করছিল ?

মীরা আশ্চর্য হয়ে গেল।

—সে কি ! ওকে চিনিস্‌নে ?

ওর কথার ভেতরে যে একটা চাপা শ্রদ্ধার ইঙ্গিত ছিল, তাতে সারা গা আমার জ্বালা করে উঠল। বললুম, আমার পরম দুর্ভাগ্য যে মহামানবটিকে আমি ঠিক চিনতে পারলুম না। উনি কে ?

—আরে ও যে ফোর্থ ইয়ারের বিশ্বজিৎ মল্লিক।

—তা থেকে কী প্রমাণ হল ?

--প্রমাণ আবার কী হবে ?—মীরা বিরক্ত হয়ে বললে, কলেজের পাণ্ডা, প্রিন্সিপ্যাল্ পর্যন্ত ওকে ভয় করেন। দারুণ ছেলে !

—ভয় তো তুইও করিস মনে হচ্ছে।

—তা করি বই কি একটু আধটু।

আমি দাঁতের ভেতরে শক্ত করে কামড়ে ধরলুম পেনসিলটা। বললুম এই করেই তোরা ওদের মাথায় তুলে দিস। একদিন আমার পাল্লায় পড়লে, ঠিক ঠাণ্ডা করে দেব ওকে।

মীরা হেসে বললে, ভাবিস নি কৃষ্ণা, দিন আসছে। কদিন বাদেই ইউনিয়নের ইলেক্‌শন। দাঁড়া না ওদের দলের এগেন্‌স্টে। লড়ে যদি

ওদের ক্যাণ্ডিডেট্‌কে হারিয়ে দিতে পারিস, বুঝব কেমন ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ান তুই !

চ্যালেঞ্জ !

আমি কৃষ্ণা সেনগুপ্ত, সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চ্যালেঞ্জ মেনে নিলুম। আমার বাবা গভর্নমেণ্ট স্কুলের হেড মাস্টার, কিন্তু তাঁর চাইতেও বড়ো পরিচয় তাঁর ব্যক্তি-চরিত্র। সেই অনেক কাল আগে—আমি তখন খুব ছেলেমানুষ, বাংলা দেশ ভাগ হয় নি তখনো, বাবা তখন ইস্টবেঙ্গলের একটা জেলা স্কুলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টার। হঠাৎ খবর এল, তাঁকে সুপারসীড করে আর একজন জুনিয়ারকে হেড মাস্টার করবার কথা চলছে। বাবা তৎক্ষণাৎ ডি-পি আই-কে চিঠি লিখলেন, এমন অন্যায় কখনো হতে পারে না, আর হলে, তৎক্ষণাৎ তিনি রেজিগনেশন দেবেন।

টীচার হিসেবে, মানুষ হিসেবে, বাবার দুর্দান্ত নাম ছিল। চিঠিটা লাল ফিতেয় বাধা পড়ল না, কিংবা বাজে কাগজের ঝুড়িতেও চালান হয়ে গেল না। তৎক্ষণাৎ কাজ হল।

আর একটা ঘটনা মনে আছে।

একবার ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছেন স্কুলে। ক্লাস টেনের ছেলেদের কী একটা ইংরিজি গ্রামারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

একটি ছেলে জবাব দিতেই ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, হয়নি।

বাবা ফস্‌ করে বলে ফেললেন, কেন হয়নি ?

—ওটা ও হবে না।

—তবে কী হবে ?

ইন্‌স্‌পেক্টর বিরক্ত হয়ে বললেন, ডোণ্ট বিহেভ লাইক এ স্কুল বয়। এই সাধারণ ভুলটা আপনি বুঝতে পারছেন না ?

বাবা শক্ত হয়ে বললেন, ভুলটা আপনারই। আমার কোনো

ক্লাস টেনের ছাত্র এ ধরনের ইন্‌ফ্যানটাইল্‌ মিস্‌টেক্‌ করলে তাকে আমি নীচের ক্লাসে নামিয়ে দিতুম।

ইন্‌স্‌পেক্টরের মুখ চোখ রাঙা হয়ে গেল। বললেন, মিস্টার সেনগুপ্ত—

বাবা বললেন, রো অ্যাণ্ড ওয়েবের গ্রামারটা একটু খুলবেন। অনেকদিন আগে পড়েছেন কিনা, খুব সম্ভব ভুলে গেছেন।

এক ক্লাস ছেলে, একদল টীচার, সকলের সামনে যেন বোমা ফাটল। ইন্‌স্‌পেক্টার দুম দাম করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। শুনেছি, কাগজপত্রে একরাশ লেখালেখির পর ইন্‌স্‌পেক্টরই বাবার কাছে অ্যাপলজী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

আমি তাঁরই মেয়ে। সেদিনই ঠিক করলুম সুযোগ পেলেই বিশ্বজিৎ মল্লিকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেব।

তারপর অনেকবার তোমাকে দেখেছি। দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে হাত-পা ছুড়ে তর্ক করতে, দেখেছি বীরের মতো বুক টান করে কলেজের করিডোরে সিগারেট ধরাতে। শ্রদ্ধা হয় নি, বরং শেক্‌স্‌পীয়ারের কথা মনে হয়েছে বার বারঃ ফুল অব্‌ সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফিউরি সিগনিফায়িং নাথিং।

মীরাকে বলতুম, তোর হীরো বিশ্বজিৎ মল্লিককে দেখলে আমার কী মনে হয় জানিস? ডন কুইক্‌সোট্‌।

মীরা ক্ষুণ্ণ হতঃ ওসব বলিস্‌ নি। সত্যিই ও খুব শার্প ছেলে, দারুণ সীরিয়াস্‌।

—এত শার্প আর সীরিয়াস্‌ই যদি, তবে দু বছর ধরে কলেজে পিলার হয়ে আছে কেন?

—পরীক্ষা দেয় না। কলেজ অথরিটি তো ওকে তাড়াতে পারলেই খুশি হয়, ও বলে, তারই প্রতিবাদে এখান থেকে ও নড়বে না।

—খুব ভালো। যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ কলেজে ঘাঁটি করে থাকুক। নিজের নাতি-নাতনীর সঙ্গে বি-এ পড়বে।

মোটের ওপর তোমার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল জাগল। শ্রদ্ধা তোমাকে এক বিন্দুও করি নি, কিন্তু পরীক্ষা-না-দেওয়া দাড়িওলা ঝাঁকড়াচুলো একটি লম্বাটে ফর্সা ছেলের মধ্যে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কী অসামান্য গুণাবলীর সন্ধান পেয়েছে, সেইটে না জানা পর্যন্ত কেমন যেন একটা অস্বস্তি আমায় পীড়া দিতে লাগল। অনেক কাল আগে কোন্ এক রসিক ব্যক্তি কৌতূহল বৃত্তিটার সঙ্গে মেয়েদের নাম জুড়ে দিয়েছিলেন, কথাটা মিথ্যে নয়—অন্তত আমি সেটা স্বীকার করব।

এইখানে একটা উপমা মনে এল। শুনেছিলুম, কৌতূহলের জন্যেই অনেক সময় বনের হরিণের প্রাণ যায়; একটা নতুন রকমের, অদ্ভুত ধরনের কিছু দেখলেই ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার জন্যে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসে তার দিকে, আর সেই সুযোগে শিকারীর বন্দুকের গুলি তাকে অভ্যর্থনা করে।

কিন্তু তখনো আমার দেরী ছিল।

বিশ্বজিৎ, যেদিন তোমাকে প্রথম আলাদা চোখ দিয়ে দেখলুম, সেদিনের খবর তুমি একেবারেই জানো না। বিকেলে সেদিন যখন কলেজ ছুটি হল, তখন আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি। মেঘে মেঘে অন্ধকার ঘনাচ্ছে, হাওয়ায় মাতলামি, ট্রাম লাইনে জল দাঁড়াতে শুরু করেছে, বৃষ্টি সহজে থামবে বলে মনে হল না। ভিজতে ভিজতেই অর্ধেক ছেলেমেয়ে রওনা হয়ে পড়ল।

আমার সঙ্গিনী আর একটি মেয়ের সঙ্গে ছাতা ছিল—শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস একটা বেঁটে ছাতা বগলদাবা করে চলাই ওর অভ্যাস। ওরই ছাতার তলায় অর্ধেক ভিজতে ভিজতে চলেছি হস্টেলের দিকে।

আমাদের একটু আগেই চলেছিল আর একটি মেয়ে—বোধ হয় ফার্স্ট ইয়ার কিংবা সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। মেয়েটি হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বুকের কাছে বই খাতা চেপে ধরে, ধারা-স্নান করতে করতে এগিয়ে চলেছিল, স্যাণ্ডেলের ছিটকে ওঠা জলকাদায় পরনের নীল শাড়ী আর সাদা সায়া একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

পাশেই চায়ের দোকান। কিছু ছেলে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। চা সিগারেট এবং হুল্লোড় চলছে। সেখান থেকে হঠাৎ চড়া গলার গান ভেসে এল :

"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর,
সেই হইতে হিয়া হিয়া নহে মোর
মনমথ জ্বরে ভোর—"

গানটি ভালোই, বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলী। কিন্তু যে ভঙ্গিতে গাওয়া হল, যে হাসির শব্দ উঠল তার সঙ্গে, মেয়েটি যে-ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল আর যেমন করে তার মুখের রঙ লাল টকটকে হয়ে গেল, তাতে অপমানে আমাদের শুদ্ধ পা থেমে গেল। কিন্তু কী করতে পারি আমরা! ওদের গুরুত্ব দিলে অপমানের পরিমাণটা বাড়বে ছাড়া কমবে না। মেয়েদের এ সব সইতেই হয়, উপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

তুমি তখন দোকানের দিকের ফুটপাথে একটা ওয়াটার-প্রুফ চাপিয়ে চলেছিলে। গান শুনে থমকে দাঁড়ালে, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলে একবার, তারপর সিংহের মতো লাফ দিয়ে উঠে পড়লে চায়ের দোকানে।

মুহূর্তে সব স্তব্ধ। বিশ্বজিৎ-মল্লিককে কে না চেনে!

আমরা কৌতূহলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম—এমনকি নীল শাড়ীপরা

মেয়েটিও। তুমি চীৎকার করে ডেকে বললে, আপনারা যাবেন না—প্লীজ একটু দাঁড়ান। আমি রাস্কেলদের কান ধরে টেনে আনছি, ক্ষমা চাইবে।

তার পরের নাটকটা এখনো মনে আছে।

দুটি অল্প বয়েসী ছেলে ভিজতে ভিজতে কাঁপতে কাঁপতে এসেছিল মেয়েটির কাছে। হাত যোড় করে বলেছিল, আমরা অন্যায় করেছি, দয়া করে ক্ষমা করবেন।

মেয়েদের সম্মান যে রাখে, তাকে দুঃখ-গ্লানি থেকে যে উদ্ধার করে, সেই তো অতীত যুগের নাইট—নাইট্-এরাণ্ট ! তারই জন্যে মেয়েদের মন যুগে যুগে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে উন্মুখ হয়ে থাকে। বিশ্বজিৎ, আমি সেদিন তোমায় শ্রদ্ধা করলুম। মনে মনে মার্জনা চেয়ে বললুম, আমিও অন্যায় করেছিলুম, তোমাকে বলেছিলুম ডন কুইকসোট্। কিন্তু তুমি স্যার ল্যান্সেলট্—রাজা আর্থারের রাউণ্ড টেবিলের মধ্যমণি।

তার পরের অংশটা থেকে তোমার সব জানা, বিশ্বজিৎ।

কিছুদিন পরেই কলেজে ইউনিয়নের ইলেক্শন এল।

লাল নীল কালির নানা পোস্টারে কলেজের ভেতরের বাইরের দেওয়াল যেন জেনারেল ইলেক্শনের রূপ নিল। তোমাদের দুটো প্রধান দল দুধারে পাঁয়তাড়া ভাঁজতে লাগল, চিৎকারে বক্তৃতায় আর কান পাতবার জো রইল না। আর সেই সময় মীরা আমায় চিম্‌টি কাটল : কিরে, বিশ্বজিৎ মল্লিকের দলকে কন্‌টেস্ট করবি নে ?

ঠিক। নিশ্চয় করব। তোমাকে শ্রদ্ধা করি বলেই তো শক্তি পরীক্ষা করব তোমার সঙ্গে।

বললুম, হ্যাঁ, করব কন্‌টেস্ট !

—রাজীব ব্যানার্জির দলে ভিড়বি ?

বললুম, না—কোনো পলিটিক্যাল্ পার্টির মধ্যে আমি নেই।

স্টুডেণ্ট লাইফে রাজনীতি করা আমি কোনোমতেই সমর্থন করি না। আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দাঁড়াব।

—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ?

-- হ্যাঁ, তাই দাঁড়াব।

তোমাদের নমিনী ছিল বিজয়া লাহিড়ী। তার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়ালুম। বিজয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না বলে রাজীব ব্যানার্জির দলও আমাকে সাপোর্ট করল খানিকটা। তুমি বক্তৃতা দিয়ে বললে, কেন আপনাবা ভোট দেবেন কৃষ্ণা সেনগুপ্তকে ? যেহেতু তিনি বুক-ওয়ার্ম, তিনি ভালো ছাত্রী, তিনি কারোর সঙ্গে মেশেন না ? যেহেতু পলিটিক্সের নামেই তাঁর আতঙ্ক, যেহেতু কলেজ অথরিটির স্বার্থ ছাড়া তিনি আব কিছুই দেখবেন না ? আপনারা ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তকে ভোট দিতে পারেন, কিন্তু জেনে রাখবেন, তাঁকে ভোট দেওয়া আর প্রিন্সিপ্যালকে ভোট দেওয়ার ভেতরে কোন তফাৎ নেই।

কিন্তু তোমার আশ্চর্য বক্তৃতায় কোনো ফল হল না বিশ্বজিৎ। অঘটন ঘটল। পঁচিশ ভোটে বিজয়া লাহিড়ীকে হারিয়ে আমি ইলেক্শন জিতলুম। রাজীব ব্যানার্জির দল কলেজ ফাটিয়ে জয়ধ্বনি তুলল।

আর তারই মধ্যে তুমি এগিয়ে এলে আমার দিকে। সোজা হয়ে, বুক টান করে। আমার চোখের ওপর তোমার জ্বলন্ত তীক্ষ্ণ চোখ দুটো রেখে বললে, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌!

বিশ্বজিৎ, সেইদিন তোমায় আমি ভালোবাসলুম।

॥ দুই ॥

বিশ্বজিৎ, আমার জীবনে বসন্ত এল।

আমি কবিতা করে কথাটা বলছি না। তুমি চিরদিন রোম্যান্টিকতার তীব্র সমালোচনা করেছ, আমিও বরাবর একমত থেকেছি তোমার সঙ্গে। তোমার পথ বাস্তব, জীবনবোধ বাস্তব, তোমার লক্ষ্য বাস্তব। বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে তুমি পড়ছিলে, অধ্যাপকেরা দুঃখ করতেন, পলিটিক্সের পোকা লেগে একটা ফুল নষ্ট হয়ে গেল। তুমি হেসে বলতে, যদি বা কোনোদিন অনার্স পরীক্ষা দিতুম, ওঁদের রোম্যান্টিক্ বিলাপ শুনেই সে বাসনাকে আমি বিসর্জন দিয়েছি।

আমি বলতুম, তোমার ভালোর জন্যেই তো বলেন ওঁরা। রাগ করো কেন?

তুমি আরো তীব্র হয়ে উঠতে। বলতে, আমাদের ইণ্ডিয়ান সায়েনটিস্ট্‌দের কাছ থেকে বিজ্ঞান! আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৈষ্ণব কবিতার বন্যা, রক্তে রক্তে রবি ঠাকুরের খ্যাপামো। আমাদের প্রোফেসারেরা ইথাইল-মিথাইলে রসের সন্ধান পান, ইথার ওঁদের কাছে অসীম অচেনার বাণী বয়ে আনে। সায়েন্স্ আমাদের জিনিস নয়। কোনোদিন ও বস্তু আমরা নিতে পারিনি—ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণ নিতে পারব কিনা, এ ব্যাপারে আমার প্রচুর সন্দেহ আছে।

আশ্চর্য হয়ে বলতুম, বলো কী! এই সব নামকরা বৈজ্ঞানিক—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র—

তুমি বলতে, থামো। যে দুজনের নাম করলে তাঁরাই আমার বক্তব্যের সব চাইতে ভালো ইলাস্ট্রেশন। প্রফুল্লচন্দ্র কি করলেন?

আধুনিক কাল রইল পড়ে—খুঁজতে গেলেন হিন্দু কেমিস্ট্রির তত্ত্ব। ভাবতে পারো ইয়োরোপের কোন মডার্ণ সায়েন্টিস্ট্ কাজ-কর্ম ফেলে রেখে অ্যাল্‌কেমিস্ট্‌দের নিয়ে বই লিখছেন বসে বসে? জগদীশচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ছাখো। রেডিয়ো-ফিজিক্সের একটা নতুন দিগন্তে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় অরণ্য প্রীতি যাবে কোথায়? নিয়ে পড়লেন 'বটানি'—বন-চাঁড়ালকে নাচিয়ে প্রমাণ করলেন যে গাছপালারও সেন্‌সেশন আছে। ওই তত্ত্বটুকু আবিষ্কার করবার জন্যে অত বড়ো প্রতিভার অমন ওয়েস্টেজের কোনো দরকার ছিল না। আসলে ভারতীয় মিস্টিসিজম্ আর বাঙালীর চিরকালের রোম্যান্টিসিজম ওঁকে ওই দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। কোথায় তা নিয়ে সারা দেশে লোকের উচ্ছ্বাস উঠবে, তা নয়—তোমাদের কবিরা আবার তারিফ করে লিখলেন: "লজ্জাবতী লতার কি যে বেদন তাহা বঝেছ গো!" শেম্!

তোমার কথা শুনে বুক দুরু দুরু করে উঠত আমার। বাংলা দেশের সেরা মানুষগুলোকে এইভাবে নস্যাৎ করবার সাহস দেখে হাত-পা যেন ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসত। আর মুগ্ধ হয়ে আমি চেয়ে থাকতুম তোমার দিকে। আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী নই, তোমার কথার সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার দর্প রাখি না, শুধু মনে মনে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক্ কবিতাই মনে পড়ত: "বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন-নাশন।" প্রকাশ্যে বলবার উপায় ছিল না, জানি, অট্টহাসিতে আমার উচ্ছ্বাসটাকে তৎক্ষণাৎ তুমি উড়িয়ে দিতে।

কিন্তু যা বলছিলুম। আমার জীবনে বসন্ত এল।

আমাকে ক্ষমা কোরো। আমরা মেয়েরা এক-আধটুকু রোম্যান্টিক্ হয়েই জন্মেছি। আমাদের রঙিন শাড়ী, আমাদের একটুখানি প্রসাধন, আমাদের কপালে কুঙ্কুমের টিপ, আমাদের আবেগ—সব মিলিয়ে

তোমাদের যুক্তিবাদী মনের সঙ্গে পুরো পাল্লা দেওয়া আমাদের পক্ষে শক্ত। যখনই আমরা বেপরোয়া হয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যাই, তখন নিজের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ করতে হয় বলেই অনেকখানি আতিশয্য এসে যায় আমাদের ভেতরে। জানি, মেয়েরাই হয়তো বেশি করে আমার কথার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু বিশ্বজিৎ, সত্যটাকে মনের আড়ালে তো অন্তত লুকিয়ে রাখা যায় না।

না—আমি ইমোশ্যনের পুতুল নই। সাধারণ মেয়ের মতো আমার ইমোশ্যন আছে, কিন্তু যুক্তিকে শ্রদ্ধা করতে জানি, নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার দরকার হলে আমি ভয় পাই না! আর তা-ই যদি না হত, চিরদিনের অভ্যাস-শিক্ষা-সংস্কার ছাড়িয়ে আমি কেমন করে আসতুম তোমার কাছে? ছেলেবেলা থেকে যে সংকল্প বুকে নিয়ে এতটা পথ এগিয়ে এসেছি, কেমন করে আমি তাকে বিসর্জন দিতে পারলুম, কেমন করে মনেপ্রাণে তোমার শিষ্যা হতে পারলুম?

মনে আছে, ইউনিয়নের প্রথম মীটিঙেই তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া লাগল।

সামনে পূজোর ছুটি, আমাদের বার্ষিক উৎসব। তুমি প্রস্তাব করলে. এবার অমুক দেশনেতাকে আমাদের সভাপতি করে আনা হোক। রাজীব ব্যানার্জির দল আর একজন পাল্টা নেতার নাম তুলল।

আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম তখন। পরিষ্কার স্পষ্ট গলায় বললুম, একটা কথা আমার জানবার আছে। আমাদের কলেজ সোশ্যাল কি একটা বার্ষিক উৎসব, না রাজনীতির সভা?

তোমার চোখ জ্বলে উঠল। বললে, তার মানে?

—খুব সোজা। বার্ষিক উৎসবে হয় কোনো শিল্পী-সাহিত্যিক আসবেন, নইলে কোনো এডুকেশনিস্ট্। বিশেষ দলের নেতা এসে

যদি পার্টি-প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা করতে চান—তাহলে তাঁর প্ল্যাটফর্ম ময়দানের মীটিঙে, এখানে নয়।

তুমি বললে, আজকের যুগে সংস্কৃতি আর রাজনীতি একসূত্রে বাঁধা। সংস্কৃতির নেতৃত্ব আজ তাঁরাই নিতে পারেন যাঁরা রাজনীতি আর জীবনকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন।

আমি বললুম, হ্যা, সেই রাজনীতিকদের হাতেই আজ সংস্কৃতির মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে।

তুমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলে কিছুক্ষণ। খুব সম্ভব কোনো মেয়ের কাছ থেকে এ-ধরণের প্রতিবাদের অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে এই প্রথম। বললে, আমি জানতুম না, আজকের দিনেও এ-সব কথা কেউ ভাবতে পারে।—সেই ব্যঙ্গের হাসিটায় ভরে উঠল তোমার মুখ। আমি জ্বলে উঠলুম সেই হাসি দেখে। তীক্ষ্ণ করে বললুম, আপনি অনেক কিছুই জানেন না, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। রাজীব ব্যানার্জির দল 'হিয়ার হিয়ার' করে উঠল।

মুখ লাল করে উঠে দাঁড়ালো বিজয়া লাহিড়ী। বললে কৃষ্ণা সেনগুপ্তের কথায় আমি প্রবল প্রতিবাদ করছি। মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে সকলের শ্রদ্ধেয় বিশ্বজিৎদা-কে অপমান—

বললুম অপমান আমি ওঁকে বিন্দুমাত্র করিনি। ওঁর কথার আমি জবাব দিয়েছি। আজ বিজয়া লাহিড়ীর কাছে যিনি পরম শ্রদ্ধেয়, তাঁর সম্পর্কে ঠিক সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা সকলের না-ও থাকতে পারে।

রাজীব ব্যানার্জীর দল প্রবল শব্দে বেঞ্চ বাজালো।

পরের অংশটায় দারুণ কোলাহল! দুই দলই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। আমার সন্দেহ হল, এবার একটা হাতাহাতিই হয়তো হয়ে যাবে ছেলেদের ভেতর। কিন্তু দেখলুম তোমার আশ্চর্য নেতৃত্ব।

তুমি সোজা সামনের টেবিলটায় উঠে দাঁড়ালে, তোমার ভরাট গম্ভীর গলার স্বরে সারা ঘর গম গম করে উঠল।

—বন্ধুগণ, এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনারা এত উত্তেজিত হবেন না। শক্তি-পরীক্ষার সুযোগ যথেষ্ট আছে, সময়ও পাওয়া যাবে। আপাতত শান্ত হোন। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি, কুমারী সেনগুপ্ত আমাকে কিছুমাত্র অপমান করেননি এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিশেষণটা পাওয়ার জন্যেও বিন্দুমাত্র ব্যাকুল নই আমি। আপনাবা মূল আলোচনায় ফিরে আসুন। আপনারাই আমাদের বার্ষিক উৎসবের সভাপতির নাম প্রস্তাব করুন এবং ভোট নেওয়া হোক! অন্তত তিনটি করে নাম আপনারা নির্বাচন করুন, কাবণ শেষ পর্যন্ত কাকে পাওয়া যাবে বলা যায় না।

বিশ্বজিৎ, কলেজের অবিচ্ছিন্ন আধিপত্যে সেইবারই খুব সম্ভব তুমি প্রথম কম্‌প্রোমাইজ করলে। বাংলা দেশেব পথম সারির দু'জন সাহিত্যিক আর একজন আধা-রাজনীতিক দিক্‌পাল অধ্যাপককে নিয়ে তালিকা তৈরী হল।

মীটিঙের পর এগিয়ে এল রাজীব ব্যানার্জি।

—হার্টি কন্‌গ্রাচুলেশনস্‌।

—আন্তরিক ধন্যবাদ।

—খুব ভালো করেছেন কৃষ্ণা দেবী। মুখের মতো জবাব দিয়েছেন বিশ্বজিৎ মল্লিককে। আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে। এতদিন ধরে কলেজে ওরা এক নাগাড়ে ডিক্টেটরশিপ্‌ চালিয়ে আসছে এবার সেটা ভেঙে দেওয়া দরকার।

হেসে বললুম দেখা যাক।

কিন্তু বিশ্বজিৎ ওরা জানত না, আমি তোমার সঙ্গে লড়েছি শুধু তোমার শক্তিকে যাচাই করবার জন্যে। যাকে মন-প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা

করতে চাই, বিরোধিতার কষ্টিপাথরেই তার সত্যিকারের মূল্য পরখ হয়ে যাক। যে মাটির দেবতারা স্তুতির চোখের জলে গলে যেতে আরম্ভ করে, কিংবা শত্রুতার একটুখানি আঁচ লাগলেই যাদের মুখের রঙ পুড়ে কালো হয়ে যায়—তারা অন্তত মেয়েদের মনে কোনদিন আসন পায় না। এই জন্যেই বুঝি চিরকাল রাজকন্যারা বিদ্যার বিচার করে, কঠিন দুঃসাধ্য শর্তের মধ্য দিয়ে, অ্যাটলান্টার মতো দৌড় করিয়ে, ড্রাগনের মাথা দাবি ক'রে কিংবা মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিয়ে তার বল্লভের যোগ্যতা নির্ধারণ করিয়ে নিতেন।

আর সেইদিনেই কলেজে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল। আলোচনা শুনতে লাগলুম, এবার খুব জব্দ হয়েছে বিশ্বজিৎ মল্লিক। ইলেক্‌শনে হেরে গিয়েও যে বিজয়া লাহিড়ী এতদিন আমাকে অনুকম্পা করে চলেছিল এবার তার চোখে একই সঙ্গে ভয় আর বিতৃষ্ণার ছায়া দেখলুম। মীরা আমার কানে কানে বললে, সত্যি মেয়েদের ওরা যেন এতকাল মানুষ বলেই মনে করত না। তুই আমাদের প্রেস্‌টিজ বাড়িয়ে দিয়েছিস। লেগে থাক কৃষ্ণা, নেক্‌সট্ ইলেক্‌শনে তোকে আমরা কলেজের জেনারেল সেক্রেটারী করব।

একটা আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়ল আমার। বিশ্বজিৎ, তোমার সম্পর্কে এত ছেলেমেয়ের মনে এত অহেতুক বিদ্বেষ জমে আছে এ আমি এর আগে বুঝতেই পারিনি। বোধ হয় এমনিই হয়। চিরদিন যাকে ভয় করে চলেছি, চিরদিন যার নির্দেশ মেনে চলতে হয়েছে মাথা নীচু করে, তার এতটুকু পতন দেখলেই আমাদের হীনম্মন্যতা উল্লসিত হয়ে ওঠে—মনে হয় এতকালের মানসিক দৈন্য থেকে যেন অনেকখানি মুক্তি পেয়ে গেলুম।

তাই ওরা আমাকে যতই তারিফ করতে লাগল, ততই আমি অপরাধ বোধ করতে লাগলুম। তোমার অনেক ভক্তের চাইতেও

ঢের বেশি করে আমি বুঝেছিলুম তুমি কত বড়ো। আর তুমি বড়ো বলেই তো তোমার সঙ্গে লড়াই করে এত আনন্দ, তোমার নিজের জোরে তুমি আমাকে নত করাবে বলেই তো এমন করে আমি উদ্ধত হয়ে উঠলুম।

একবার নয়—বার বার।

তারপর সেই শেষ সংঘর্ষ। তোমার কাছে আমাব চরম পবাজয়। আমার সমস্ত বিদ্রোহ আর প্রতিবাদকে এক অঞ্জলি ফুলেব মতো সেইবার তোমার পায়ে নিবেদন করে দিলুম।

স্ট্রাইক ডিসিশন। ব্যাপারটা এমন ঘোবালো যে রাজীব ব্যানার্জির দল পর্যন্ত ধর্মঘটে সমর্থন জানালো।

শুধু আমিই গলা তুলে বেসুরো গাইলম। বললুম, নেতারা পলিটিক্স্ করুন, আমরা পড়তে এসেছি। এইভাবে স্ট্রাইক করে পড়া নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না।

এমনকি রাজীব ব্যানার্জির দল পর্যন্ত এবার বললে শেম-শেম!

আমি গলা চড়িয়ে বললুম চিৎকার করে আমাব কথা আপনারা ডুবিয়ে দেবেন তা জানি। নতুন ঘটনা এ নয় –চিরদিন ধরেই এ চলে আসছে। উত্তেজনা তৈরী করার একটা নেশা আছে-- তখন তার সামনে সব সত্যই মিথ্যে হয়ে যায়, যেমন করে মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে। কিন্তু এইভাবেই চিরদিন চালাতে পারবেন না আপনারা। হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের ভাগ্য নিয়ে যারা জুয়া খেলে সর্বনাশের রূপটা তাদের কাছে তখনো অচেনা, আগুন তখনো তাদের খেলবার জিনিস ; কিন্তু ঘর যখন জ্বলে ওঠে—যখন নিজেদের মারাত্মক নির্বুদ্ধিতার ভয়ঙ্কর পরিণামটা স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন আর তাকে শোধরাবার কোনো উপায়ই অবশিষ্ট থাকে না। আপনারা কি মনে করেন এর জন্যে ভবিষ্যৎ ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে?

কিন্তু বিশ্বজিৎ তখন ঝড়ের খেয়া ভেসেছে সমুদ্রে, তুমি তার হাল ধরেছ: সকলকে ছাপিয়ে তোমার মাথা আকাশে উঠেছে আমি তার মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেলুম। এমনকি মীরা পর্যন্ত বললে, কাজটা ঠিক হল না কৃষ্ণা, স্ট্রাইক আমাদের করাই উচিত।

আমি বললুম, তুইও?

মীরা অপরাধীর মতো বললে, কী করা যায় ভাই—যেদিকে স্রোত, সেদিকেই তো চলতে হবে।

বললুম, স্রোতের টান যদি মাঝ-নদীর ঘূর্ণির দিকে নিয়ে যায়, তা হলে সেদিকেই নৌকো ভাসাবে? দেশশুদ্ধ্‌ লোক অন্ধ বলেই যে দেখতে পায় তাকেও চোখে কাপড় বাঁধতে হবে গান্ধারীর মতো? আমাকে ভুল বুঝেছিস মীরা, আমি সে-দলের নই।

মীরা চুপ করে রইল।

জিজ্ঞেস করলুম: 'এনিমি অব্‌ দি পিপ্‌ল্‌' পড়েছিস ইবসেনের?

মীরা বললে, না।

—গল্‌স্‌ওয়ার্দির 'দি মব?'

—না।

—পড়ে দেখিস।—এর বেশি আমার আর কিছুই বলবার ছিল না।

স্ট্রাইকের আগের দিন আমি প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। আরো কয়েকটি নিরীহ ভালোমানুষ ছাত্রীও সঙ্গে ছিল, তারা ফ্রী-স্টুডেন্টশিপ পায়। সোজা গিয়ে বললুম, স্যার, কাল আমরা ক্লাস করতে চাই কলেজে। আপনাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

প্রিন্সিপ্যাল অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না।

বললুম, স্যার, কলেজ গেটে ওরা আমাদের বাধা দেবে। কী ব্যবস্থা করবেন আমাদের জন্যে ?

প্রিন্সিপ্যাল মাথা চুলকে বললেন, দেখি।

খুব সম্ভব, হাওয়ার গতিক দেখে পরদিন তাঁর কলেজ বন্ধ রাখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন কিরকম হয়ে পড়লেন। বললেন, আচ্ছা—আচ্ছা।

পরদিন আমরা কুড়ি পঁচিশটি মেয়ে আর জনদশেক ছাত্র কী করে যে কলেজের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছিলুম, সে-কথা মনে পড়লে লজ্জায় এখনো আমার মাথা কাটা যায়। একবার ভেবেছিলুম, যাই হোক— ফিরেই যাই, এসব নিয়ে গণ্ডগোল করে কী আর হবে! কিন্তু হঠাৎ সামনেই দেখলুম বিজয়া লাহিড়ীকে। সে বক্তৃতা দিয়ে বলছে, আজ এই দারুণ দিনেও যারা কলেজে ক্লাস করতে যাচ্ছে, বন্ধুগণ, ভালো করে চিনে রাখুন তাদের। তারাই দালাল—তারাই আসল পঞ্চম বাহিনী—

দালাল—পঞ্চম বাহিনী! মাথার মধ্য দিয়ে রক্ত ছুটে গেল। আমি পদ্মার দেশের মেয়ে। দেশ হারিয়েছি, কিন্তু মন হারাই নি। চিরদিনের সত্যব্রত বাবাকে আমি দেখেছি, নিজে যাকে একবার বিশ্বাস করেছেন, কোনো ভয়, কোনো প্রলোভনের সামনে তার একটি কণাও তিনি বিসর্জন দেন নি।

ফিরে যাওয়ার জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিলুম—সোজা এগিয়ে গেলুম। দু-জন প্রোফেসারকে পথ দেবার জন্যে ছেলেরা একটু সরেছিল—সেই ফাঁকে আমি ভেতরে ঢুকলুম—সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা বাঁধের পথে বন্যার মতো আরো ক'জন।—

ছেলেদের ভেতরে মারামারি হতে যাচ্ছিল, প্রিন্সিপ্যাল এগিয়ে এলেন সামনে। বললেন, যাদের খুশি স্ট্রাইক করতে পারো, কিন্তু ক্লাস করবার জন্যে যারা আসতে চায়, তাদের তোমরা বাধা দিতে পারো না।

আকাশ ফাটানো 'শেম শেম' ধ্বনির মধ্যে আমরা কলেজে গিয়ে ঢুকলুম।

ক্লাসের প্রহসন যা হল, তা না বলাই ভালো। এক-একজন প্রোফেসার বিরূপ মুখে ঢুকতে লাগলেন এবং ক্লাসের দু-তিনটি ছেলেমেয়েকে বিরস গলায় যা হোক করে পড়িয়ে যেতে লাগলেন। মনে মনে তাঁরা যে আমাদের মুণ্ডপাত করছেন, এ-কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলুম আমরা। ভাবছিলেন, এই উপদ্রব ক'টা এসে না ঢুকলে তাঁরা বাড়ী ফিরে একটি নিশ্চিন্ত ছুটির দিন পরমানন্দে উপভোগ করতে পারতেন।

কিছুক্ষণ এইভাবেই চলছিল, হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গর্জন উঠল কলেজের বাইরে। ঝড়ের সমুদ্র-উত্তাল—উতরোল্ হয়ে উঠল। মনে হল যেন প্রলয় শুরু হয়ে গেছে।

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালুম আমরা।

ভীড়ের জন্যে প্রথমটা কিছু নজরেই আসে না। তারপর দেখলুম তোমাকে। প্রসেশনের সঙ্গে গিয়েছিলে, লাঠি চার্জ হয়েছে তোমাদের ওপর। তোমার মাথা ফেটেছে, ব্যাণ্ডেজটা রক্তে মাখামাখি। এই অবস্থাতেও তুমি বক্তৃতা দিচ্ছ।

কী বলছিলে জানি না। একটি বর্ণও শুনতে পাইনি—শোনবার মতো অবস্থাও আমার ছিল না। আমি শুধু তাকিয়ে রইলুম। দেখলুম সেই জন-মন-অধিনায়ককে—এমনি করে চিরদিন যে মাথায় পরেছে রক্তে মাখা দুঃখের মুকুট; দেখলুম আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ

পুরুষকে—যার কাছে নিজেকে নিবেদন করবার জন্যেই তো এতদিন আমি বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে প্রস্তুত হয়ে উঠেছি।

বিশ্বজিৎ, আমার বিশ্বজিৎ! এতদিনে জয় সম্পূর্ণ হল তোমার।

আমি আর দেখতে পেলুম না। চোখের জলে তখন সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে।

॥ তিন ॥

বিশ্বজিৎ, তারপরের দিনগুলো যেন স্বপ্ন!

তোমার প্রস্তাব সমর্থন করে আমি যেদিন বক্তৃতা দিয়ে বললুম, বিশ্বজিৎ মল্লিকের নেতৃত্ব স্বীকার করে এগিয়ে চলাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, আজকের এইসব সংকট মুহূর্তে তিনিই আমাদের সঠিকভাবে পথ দেখাতে পারবেন, সেদিন আবার বাজ পড়ল কমনরুমে।

রাজীব ব্যানার্জির দল হাঁ করে রইল। এমনকি বিজয়া লাহিড়ীর চোখ পর্যন্ত ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। আর ঘর কাঁপিয়ে একাই হাততালি দিয়ে উঠল অসীম চৌধুরী।

মীটিঙের পরে রাজীব এসে বললে, দাউ টু ব্রুটাস্? শেষে আপনিও ওদের পাল্লায় পড়লেন!

—আমি কারো পাল্লায় পড়ি না। ভালোমন্দ যাচাই করে নেবার বুদ্ধি সামান্য কিছু আমারও আছে।

—এতদিন তাই তো জানতুম—নস্যির টিপ নিয়ে রাজীব ব্যানার্জি বললে, আমরা রাজনীতি করি, কিন্তু কমনরুমে দাঁড়িয়ে যেদিন আপনি জোরালো গলায় বলতে পেরেছিলেন যে ছাত্রজীবনে কোনো পলিটিক্যাল্ পার্টির স্লেভারিকে আপনি ঘৃণা করেন, সেদিন আপনাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করেছিলুম। মত না মিলুক আপনার ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। আজ আপনিও ঝাঁকের কই হয়ে দলে ভিড়ে গেলেন! দিস ইজ কোয়াইট্ আন্‌এক্স্‌পেক্টেড!

রাজীব ব্যানার্জির কথার ভেতর সত্য কোথাও একটা ছিল, আমাকে একটুখানি ঘা না দিয়ে গেল না। মুহূর্তের জন্যে আমি উন্মনা

হয়ে গেলুম। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। তখন তুমি আমার রক্তনাড়ীতে টান দিয়েছ, আমাকে ঘিরে ঘিরে তখন ঝড় উঠেছে। সমুদ্র নদীকে ডাক দিয়েছে, আর আমি ফিরতে পারি!

মীরা বললে, ব্যাপার কি রে!

—ব্যাপার আবার কী?

—ছিলি বিশ্বজিতের শত্রু, এখন যে জোড়হাতে পুজোয় বসে গেলি?

—আমি কারো শত্রু ছিলুম না। যখন প্রতিবাদের দরকার ছিল, করেছি। যখন সাপোর্ট করা উচিত, করব। আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।

—এখনো তাই আছিস?—মীরার স্বরে কৌতুকের আভাস।

—নিশ্চয়।

কিন্তু যত জোরের সঙ্গে বললুম, কথাটা যে ততখানি সত্যি নয়, এ কথা আমার চাইতে কে আর বেশি করে জানত! আমি আর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নই। তিলে তিলে কখন আমার পরাজয় শুরু হয়েছিল, একটু একটু করে আমি তোমার জন্যে ডালা সাজাতে বসেছিলুম; তারপর সেই রক্তমাখা মুকুট পরে যখন সামনে এসে দাঁড়ালে, তখন আর আমার কিছুই করবার নেই। আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমার পায়ে আমি লুটিয়ে পড়েছি।

বিশ্বজিৎ আমি জানি, এর আগে আরো অনেক মেয়ের মনকে তুমি জ্বালিয়েছ। তোমার শক্তি, তোমার পৌরুষ তোমার দীপ্তির যে কী আকর্ষণ সে আমার বুঝতে বাকী নেই। তোমার মুখের দিকে বিজয়া লাহিড়ীর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার অর্থ তুমি কোনোদিন বুঝতে চেয়েছ কিনা জানি না, কিন্তু মেয়েদের চোখে ও গোপন থাকে না— আমারও থাকে নি।

বিজয়া তোমাকে ধরতে পারে নি, তার মতো আরো অনেক মেয়েই হয়তো পারে নি। ওদের সাধ্য কী, তোমার সত্যিকারের

সঙ্গিনী হয়, তোমার মনকে স্পর্শও করতে পারে! তোমাকে নেবার জন্যে আলাদা শক্তি চাই—তোমার সহধর্মিনী হওয়ার যোগ্যতা সম্পূর্ণ আলাদা।

আমি বায়রনের জীবনী পড়েছি খুব মন দিয়ে। এই বহুনিন্দিত বেয়াড়া কবিটিকে নিয়ে জঘন্য কুৎসার অন্ত নেই—সব চেয়ে বেশি নিন্দা হয়তো সেই মহিলাই ছড়িয়েছিলেন, যিনি এই বিদ্রোহীকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁর স্ত্রী হয়ে এসেছিলেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পালাতে পথ পাননি! আসলে সেদিনের ইংলণ্ডের ওপরতলার পোশাকী মেয়ের দল—সেই মানুষটির বজ্রগর্জনে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। ভণ্ডামির মুখোশ খসাতে যে এসেছে, মুখোশধারিণীরা তাকে বিভীষিকা বলেই মনে করেছিল তখন। কিন্তু তারও জীবনে সত্যিকারের বিপ্লবী নায়িকা এসেছিল—সেই থেরেসা। সে প্রেম সুখের হয় নি, কিন্তু রণ-প্রান্তরের কামানের আগুনের আলোতেই তো বায়রনের সত্যিকারের মিলন-বাসর।

আমি তোমাকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা করছি না। কিন্তু তোমার এই দুরন্ত জীবনে আমি ছাড়া কে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারত বিশ্বজিৎ? তুমি আমাকে চিনে নিয়েছিলে, বুঝেছিলে তোমার অন্যান্য শিষ্যাদের সঙ্গে আমার সত্যিকাবের তফাৎ কোথায়!

ছেলেবেলার একটা সন্ধ্যা আমার মনে পড়ে। আমাদের সহরের পাশের নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি। পশ্চিমের আকাশে সূর্য ডোববার লগ্ন, আগুনের রঙে লালে লাল—ঠাকুর মা-র মুখে শোনা রাবণের জ্বলন্ত চিতা। হঠাৎ দেখলুম, নদীর এপারে পিয়াশাল বন থেকে একটা গগনভেড় পাখী আকাশে ডানা মেলে দিল; কর্কশ চিৎকার করল একটা—আরো একটা পাখী উড়ে এল ওর পাশে, মনে হল, সঙ্গিনী। আর পশ্চিমের সেই আগুন-রাঙা আকাশে পাশাপাশি

পাখা ছড়িয়ে উড়ে চলল ওরা—লাল রোদে ওদের ডানা জ্বলতে লাগল, একজোড়া আগুনের পাখী আসন্ন রাত্রির মহাশূন্যতায় কোন্ দুঃসাধ্য অভিযানে যাত্রা করল। বিশ্বজিৎ, হস্টেলের জানলা দিয়ে কলকাতার আকাশে ও-রকম আরক্তিম সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আমিও কতদিন ভেবেছি, তুমি আর আমিও অমনি অগ্নিবিহঙ্গ—আমাদের সামনে রয়েছে সুচিরশর্বরী, আর যেতে যেতে তুমি আমায় ডাক দিয়ে বলছ—এখনো দীর্ঘ পথ পড়ে আছে, এখনি—'বন্ধ করো না পাখা!'

আমি অর্ঘ্য দিলুম, তুমি নিলে। একটা বছর এক নিঃশ্বাসে পার হয়ে গেল।

ছুটিতে বাড়ী গেছি, বাবা বললেন, কৃষ্ণা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বাবার মুখের চেহারা আমি চিনি। কোথাও যে একটা মেঘ ঘনিয়েছে, সে কথা বুঝতে আমার দেরী হল না। বললুম, বলো।

বাবা একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন, পড়ো।

পড়লুম। আমাদেরই প্রোফেসার রমাপতি বাবুর চিঠি। বাবার বন্ধু তিনি, একই সঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। আর কলকাতায় তিনিই ছিলেন আমার লোক্যাল গার্ডিয়ান।

রমাপতি বাবু যে চিঠি লিখেছিলেন তা মোটামুটি এই।—কৃষ্ণা প্রথমদিকে খুবই ভালো পড়াশুনা করছিল। আমরা আশা করেছিলুম, একটা ফার্স্ট ক্লাস অনার্স সে পাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপাতত লেখাপড়ার চাইতে তার পলিটিক্সেই বেশি মনোযোগ। এই কলেজে বিশ্বজিৎ মল্লিক নামে একটি জেলখাটা ছাত্র আছে। কলেজের খাতায় নাম একটা তার লেখা আছে বটে, কিন্তু সেটা উপলক্ষ মাত্র, তার আসল উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন তৈরী করা। এই ছেলেটি নিজে তো মারাত্মক বটেই, ছেলেমেয়েদের মাথা খাওয়ায় তার জুড়ি নেই। কিছুদিন ধরে কৃষ্ণা

তার পরম অনুগত হয়ে উঠেছে। ইউনিয়ন করা, বক্তৃতা দেওয়া, ঘুরে বেড়ানো, ক্লাসে না আসা, এগুলো তার প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে উঠেছে এখন। গত বার্ষিক পরীক্ষায় সে কোনোমতে অনার্স মার্কস্ পেয়েছে, কিন্তু এভাবে চললে তার পক্ষে পাস-কোর্সে তরে যাওয়াও শক্ত হবে।

বাবা বললেন, এ-সব কথা কি ঠিক?

বাবার সামনে, মিথ্যে কথা বলতে শিখিনি। বললুম, বিশ্বজিতের সঙ্গে আমি মিশি। পড়াশুনো একটু কম হয়েছে তা-ও ঠিক। কিন্তু পরীক্ষার সময় আমি মেক-আপ করে নেব।

বাবা বললেন, তাতে আমি সন্দেহ করি না। পড়াশুনোর দায়িত্ব তোমার নিজের, আর সে সম্বন্ধে তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু তুমি কি পলিটিক্সে ভিড়েছ আজকাল?

—কিছু বুঝতে চেষ্টা করছি।

বাবার মুখের রেখা শক্ত হয়ে উঠল: সেটা পরীক্ষার পরে বুঝলে ভালো হত না?

বললুম, এ যুগে রাজনীতি বাদ দিয়ে শিক্ষার কোনো অর্থ হয় না।

—তাই তোমার বিশ্বাস?

—তাই আমার বিশ্বাস।

—তুমি ঠিক জানো, আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ না?

—না, বাবা। আমার আত্মমুক্তি ঘটছে।

বাবা কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন ডিমের ভেতরটা শক্ত হওয়ার আগেই যদি তার খোলা ভাঙে, তা হলে পাখির ছানা যে মুক্তি পায়—সেটা কী, জানো?

—জানি। আবার ভেতরটা শক্ত হওয়ার পরেও যে পাখির বাচ্চা মুক্তি পায় না, তার অবস্থা যে কী হয় তা-ও আমার অজানা নয়।

বাবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বললেন, তাহলে তোমার ডানায় এখন তুমি ভর করতে পারো?

দর্শনের ছাত্র বাবা নিজেই আমাকে তর্ক করিতে শিখিয়েছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সে শিক্ষা আমি পেয়েছি। বললুম, তাই তো মনে হয় বাবা। আমাকে বরং পরীক্ষা করতে দাও।

—পরীক্ষা তুমি নিশ্চয় করতে পারো। কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, আমার কাছ থেকে এক বিন্দু সহানুভূতিও যে কোনোদিন পাবে না, সে কথা ভালো করেই মনে রেখো।

—মনে রাখব।

আর আলোচনা হল না। ওর মধ্য দিয়ে বাবা যা বলবার বললেন, আমার যা বলবার বলে নিলুম। অর্থাৎ, এতদিন পরে বাবার কাছ থেকে আমি আলাদা হয়ে গেলুম। আমাদের দু-জনের মাঝখানে সমুদ্রের রেখা দেখা দিল।

আমার মা নেই। ছেলেবেলা থেকেই বাবার মেয়ে হয়ে আমি বড়ো হয়ে উঠেছিলুম। আজ বুঝতে পারলুম, এই স্নেহ এই ঘর চিরদিনের নোঙরের মতো এই নিশ্চিন্ত আশ্রয় আমার ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। আমার বাবাকে জানি, তাঁর অসীম গভীর মমতাও জানি; কিন্তু তার সঙ্গে এ-ও জানি, সত্যাশ্রয়ী বাবা জীবনে কখনো কারো সঙ্গে কম্‌প্রোমাইজ্‌ করেন না। যদি মন থেকে একবার আমি সরে এসে থাকি, তাহলে সেখানে ফিরে যাওয়ার পথ জীবনে আর কখনো আমি খুঁজে পাব না।

ছুটির দিন ক'টা একটা দুঃসহ ভারের মত কাটল। আসার দিন বাবাকে প্রণাম করে বললুম, যাচ্ছি বাবা।

বাবা বললেন, সুখী হও।

কথাটা চিরদিন বলে আসছেন, এই তাঁর বরাবরের আশীর্বাদ।

কিন্তু আজ যেন গলার স্বরটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের ঠেকল। ট্রেনে রিজার্ভেশন বাবা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সারাটা রাত আমি এক বিন্দু ঘুমুতে পারলুম না। প্রতিটি স্টেশনের আলো, বাইরের অন্ধকার, জোনাকি-জ্বলা ঝোপঝাড়, আকাশভরা তারা, প্রত্যেকটা ব্রীজের গুম গুম শব্দ যেন আমার ছু'কান ভরে বলতে লাগল : 'আসব না—আসব না, এই চেনা পথে আমি আর কোনোদিন ফিরে আসব না।' এই রাত্রের ট্রেনটা আমার চেনা জগৎ থেকে আর এক অন্ধকার অনির্দেশের মধ্যে আমায় নিয়ে চলেছে, যে-চলার শেষ কোথায় জানি না, যে ট্রেনের কোনো টার্মিনাস আছে কিনা তা-ও আমার জানা নেই!

একটা ক্লান্ত, ভারী মন নিয়ে হস্টেলে ফিরলুম। ছুপুরটা অসুস্থ আধ-ঘুমের মধ্যে কেটে গেল। তারপর বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে বেয়ারার হাতে স্লেট এল : বিশ্বজিৎ মল্লিক।

মুহূর্তে ভুলে গেলুম সব। ছুটে নেমে গেলুম দেখা করতে।

তুমি বললে, কবে ফিরলে?

—আজই।

—আমি পরশু এসে তোমার খোঁজ করে গেছি। অনেকগুলো জরুরী আলোচনা আছে তোমার সঙ্গে। বেরুবে একটু?

—দাঁড়াও, আসছি।

ছুজনে এলুম কলেজ স্ট্রীটে ছাত্র-ছাত্রীদের সেই বিরাট আড্ডাখানায়। অসংখ্য চেনা মুখের অভ্যর্থনা। টেবিলে গোল হয়ে কিছুক্ষণ বসা, কফি আর বাদাম নিয়ে তর্ক। কিন্তু তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। তুমি বললে, উঠবে কৃষ্ণা?

হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে বললুম, ঘণ্টা খানেক সময় আছে এখনো।

—তা থাক, এসো।

—কোথায়?

—চলো, কাজ আছে।

কলেজ স্ট্রীটের ভিড় ছাড়িয়ে দুজনে ইডেন হস্টেলের নির্জন পথ দিয়ে হাঁটছিলুম। হঠাৎ তুমি বললে, দাঁড়াও।

আশ্চর্য হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখলুম, একটা অচেনা আলোয় তোমার চোখ জ্বলছে, তোমার ঠোঁট দুটো কাঁপছে অল্প অল্প। তুমি একটা রেলিঙে ভর দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলে, সিগারেট ধরাতে গিয়ে তিন-চারটে কাঠি নষ্ট করলে। আমি তখন একটা কিছু অনুভব করতে পারলুম। গাছের ছায়া অন্ধকার হয়ে আসছে, হাওয়ায় পাতা কাঁপছে, কোথা থেকে ফুলের গন্ধ আসছে, সামনে ইউনিভার্সিটির দৈত্যের মতো বাড়ীটা দুর্গের মতো স্থির হয়ে আছে। সব মিলে আমি বুঝতে পারছিলুম, একটা কিছু আসন্ন হয়ে আসছে।

তুমি বললে, কৃষ্ণা, আই লাভ ইউ।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল একবার। আমি অনুভব করেছিলুম, আমি জানতুম, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ছিলুম তোমার জন্যে। তবু সমুদ্রের এতবড়ো ঢেউটা সইতে পারলুম না, যেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

তুমি আবার ডাকলে, কৃষ্ণা!

—বলো!

—আমি রোম্যান্টিক নই, আমি ইমোশন্যালও নই। কিন্তু জীবনের যা দাবি, তাকে অস্বীকার করবার মতো কাপুরুষতাও আমার নেই। আমি তোমাকে পেতে চাই।

আমি জবাব দিতে পারলুম না।

—তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসো, সে-কথা আলাদা। আমি তৎক্ষণাৎ তোমায় মুক্তি দেব, জীবনে দ্বিতীয়বার এ-কথা তোমার

সামনে উচ্চারণও করব না। শুধু একটা পরিষ্কার জবাব চাই তোমার কাছ থেকে।

তোমার কথারই পুনরাবৃত্তি করলুম আমি : আই লাভ ইউ।

চাপা রইল না, কিছুই চাপা থাকে না। চোখ বলে দেয়, প্রত্যেকটা চলা-ফেরার মধ্য দিয়ে ঠিকরে পড়ে। প্রেমে পড়ে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে, পৃথিবীতে এমন মেয়ে পুরুষ আজো জন্ম নেয়নি।

বিজয়া লাহিড়ী কেন হঠাৎ ইউনিয়ন ছাড়ল, সে কথা আমার চাইতে বেশি করে কে জানে! ফোর্থ ইয়ারে উঠে কেনই বা সে ট্রান্সফার নিলে, সে রহস্যও আমার অজানা রইল না।

কলেজে গুঞ্জন চলতে লাগল। একদিন দেওয়ালে দেখলুম বিশ্বজিৎ মল্লিকের সঙ্গে যোগ চিহ্ন দিয়ে কৃষ্ণা সেনগুপ্তের নাম লেখা।

মীরা বললে, কী কাণ্ড রে এ-সব?

—কী কাণ্ড?

—তোরা নাকি—

বললুম, যা ভাবছিস তার চাইতেও বেশি।

—মানে?

—আমি বিশ্বজিৎকে বিয়ে করব।

—এতদূর গড়িয়েছে?

—এতদূরেই তো গড়ানো উচিত। যাকে বিয়ে করবার কথা ভাবিনি, তার সঙ্গে খামোখা ফ্লার্ট করে বেড়ানোর মতো রুচি বা সময় কোনোটাই আমার নেই। জীবনকে আমি অন্যভাবে দেখি। অনেক বেশি সীরিয়াস্‌লি।

মীরা আমার বিছানাটার ওপর ধুপ করে বসে পড়ল।

আমি হেসে বললুম, কিরে, দারুণ নার্ভাস হয়ে গেলি দেখছি। মনে হচ্ছে, বিশ্বজিতের সঙ্গে বিয়েটা আমার নয়, তোরই হচ্ছে, আর সেই ভুর্ভাবনায় এখনই তোর মাথা ঘুরছে বা ঘুরে গেছে।

—ঠাট্টা নয় কৃষ্ণা। ভালো করে ভেবে ছাখ জিনিসটা।

—ভালো করেই ভেবেছি। না ভেবে কোনো কাজ জীবনে আমি করি নি।

—আমার মনে হয়, তুই সুখী হবি না।

—অপরাধ?

—এক ধরনের মানুষকে শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু তাদের নিয়ে ঘর করা যায় না। বিশ্বজিৎ সেই দলের।

—তোর এক্স্‌পিরিয়েন্স আছে বুঝি?

—ইয়ার্কী করিসনি কৃষ্ণা। যে-লোকটা রাজনীতি করবে, সারাজীবন হুল্লোড় করে বেড়াবে, জেল খাটবে—কী সুখ পাবি তাকে বিয়ে করে? জীবনে সে কী দেবে তোকে?

নিতান্তই মেয়েলি যুক্তি। সেই ঘর-সংসার সম্পর্কে চিরকালের ধারণা, চিরদিনের হিসেবী ভ্যালুয়েশন। আমার হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু মীরার গম্ভীর কাতর মুখ দেখে ভারী মায়া হল আমার, হাসতে পারলুম না। কলেজে সেই আমার সব চাইতে আপন বন্ধু, আমাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসে মেয়েটা।

বললুম, ঘর আমরা বাঁধব না।

—মানে?

একসঙ্গে কাজ করবার জন্যে বিয়ে করব।

মীরা বললে, একসঙ্গে কাজই যদি করতে হয়, তা হলে বিয়ে করবার দরকারটাই বা কী? সে তো এমনিতেও চলতে পারে।

দারুণ যুক্তি একটা। চট করে জবাব দেওয়া শক্ত।

বললুম, বিয়ে করব ভালোবাসি বলে। আর বিয়ে করলেই সংসার বেঁধে বসতে হবে তার কোনো মানে নেই।

—কী করবি তা হলে?

রবীন্দ্রনাথ আউড়ে আমি বললুম:

"উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে,
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে—"

—কবিতাই কি জীবন?

—না, জীবনটাই কবিতা।

মীরা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো।

—এখনো সময় আছে কৃষ্ণা। ভালো করে ভেবে দেখিস।

বললুম, আমার নতুন করে কিছু ভাবনার নেই। সব ভাবনা শেষ করে দিয়েছি।

হ্যাঁ, সব ভাবনাই শেষ করে দিয়েছি। তোমার পথ আমার পথ এক হয়ে মিলে গেছে। বড়দির বিয়ের সময় শোনা সেই মন্ত্র তোমার মুখ থেকে আমার দু-কানে বাজতে লাগল: 'ওঁ ব্রতে তে হৃদয়ঞ্চ মনঞ্চ দধাতু।' আর আমি প্রতিধ্বনি করে বলতে লাগলুম, দিয়েছি দিয়েছি, তোমার ব্রতে আমার হৃদয় মন সব দিয়েছি।

তোমার সঙ্গে সেই দিনগুলো। বাইরে ভেতরে, নিরালা অবসরে। চায়ের দোকানে। গঙ্গার ধারে সব সময় মনের ভেতর গুনগুন করে বেজেছে, 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।' ভালো গান গাইতে শিখিনি, কিন্তু আমার সমস্ত ভালোবাসাকে গানে গানে ভরে দিয়েছি।

কিন্তু কোনোদিন রোমান্টিক্ হইনি তোমার সামনে। জানি, ওই ন্যাকামিটা তুমি একেবারেই সইতে পারো না।

তারপর সেই চরম মুহূর্ত এল। রমাপতিবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেয়ে বাবা চলে এলেন কলকাতায়। স্লেটের ওপর তাঁর বাঁকা বাঁকা কাঁপা কাঁপা লেখা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, এবার সত্যিই নোঙর ছিঁড়ল।

ভিজিটার্স রুমে চুপ করে বসেছিলেন বাবা। ঘরে তখনো আলো জ্বলেনি, একটা বিমর্ষ ছায়া জমে আছে সেখানে। মনে হল বাবাও যেন ছায়া হয়ে গেছেন। শুধু চশমার কাচ দুটো অদ্ভুত ভাবে জ্বলছে।

আমি প্রণাম করলুম। বাবা একটা কুশল প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না। আমিও না। অনেকক্ষণ ধরে একভাবে চুপ করে রইলুম দুজনে। বাবা চেয়ারে বসে, আমি সামনে দাঁড়িয়ে।

তারপর একটা নিঃশ্বাসের শব্দ উঠল বাবার। খস্‌খসে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সেই বিশ্বজিৎকেই—

তৈরী হয়েই এসেছিলুম। যে আঘাত দিতেই হবে, তার জন্যে আর বেশিক্ষণ আড়াল টেনে রাখবার কোন মানে হয় না। আমি পরিষ্কার গলায় বললুম, হাঁ বাবা, ওকে আমি ভালোবাসি।

—বিয়ে করতে চাও ?

—তোমার আশীর্বাদ চাইছি।

—আশীর্বাদ যদি না করি ?

—তা হলে ও ফাঁকটুকু থেকেই যাবে। কিন্তু বিশ্বজিৎকে বিয়ে আমি করবই।

আবার সেই ছায়ার মধ্যে বাবা ছায়া হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এবার আর চশমার আড়ালে চোখ দুটোকে দেখতে পেলুম না, নামিয়ে রেখেছেন নীচের দিকে। জানি না, জল পড়ছিল কিনা।

বাবা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

—ফাঁকটা রইল। আর এই কথাটাই তোমাকে জানাতে এসেছিলুম।

বাবা বেরিয়ে গেলেন। আর একটা কথারও দরকার ছিলনা।

আমি প্রণাম করতে পারলুম না, কুশল জিজ্ঞেস করতে পারলুম না। জানতুম, প্রণাম আর নেবেন না, কুশল জানবার দাবিও আর আমার নেই।

হু'পা গিয়ে বাবা ফিরে এলেন। আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন : আসছে মাস থেকে আব টাকা পাঠাব কী ?

আমি বললুম, না—দরকার নেই।

তার সাতদিন পরে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে আমরা নোটিশ দিলুম। আরো সাতদিন পরে ফর্মে সই করে, ট্যাক্সি চেপে আমি হাজির হলুম তোমাদের বাড়িতে। নতুন পালা শুরু হল আমার।

॥ চার ॥

আমি কোনো আশা নিয়ে আসিনি তোমার ঘরে। মীরাকে যে-কথা বলেছিলুম, আমি তো তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাইনি। পথে চলবার জন্যেই তোমার সঙ্গে রাখী বেঁধেছি নিজের। ঘর করবার লোভটাই যদি থাকত, তাহলে আমি ঘর ছাড়তুম না।

মনে আছে, যখন বললুম, আসছে মাস থেকে বাবা আর খরচ দেবেন না, তখন একটুখানি ছায়া নামল তোমার মুখে।

—তা হলে ?

বললুম, আগে আমাকে তোমার করে নাও। তারপর ভাবব।

—কিন্তু আমার তো কোনো রোজগার নেই। তোমার পড়ার খরচ কি ভাবে চলবে ?

—কোনও একটা চাকরি যোগাড় করে নেব স্কুলে-টুলে। দুপুরে কলেজ, সকালের দিকে চাকরি হলে কোনো অসুবিধে হবেনা।

—আর থাকবে কোথায় ?

ঘর আমি বাঁধতে চাইনি। তবু ঠাট্টা করে বলেছিলুম, কেন, তোমার বাড়িতে আমার একটুখানি জায়গাও হবেনা ?

তোমার আত্মসম্মানে ঘা লাগল। বললে, নিশ্চয় হবে। কিন্তু আমি ভাবছিলুম, তুমি পাশ-টাশ করে গেলে—

—দেখতেই পাচ্ছ কী বিশ্রী ব্যাপার একটা ঘুলিয়ে উঠছে চারদিকে। আমি কাউকেই আমাকে নিয়ে কোনো নালিশের সুযোগ দিতে চাইনা। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই এখুনি।

তুমি রেস্তোরাঁর চায়ের কাপে টোকা বাজাতে বাজাতে বললে, বেশ, তাই হবে।

হয়ে গেল বিয়ে। তার আগে আমি তোমার বাড়ি কখনো দেখিনি, তোমাদের সাংসারিক অবস্থা যে কি রকম, তা নিয়েও কিছুমাত্র মাথা ঘামাই নি। তোমার উজ্জ্বল পরিচয়েই তোমাকে জেনেছি, বুঝেছি তুমি বৃন্তহীন, স্বয়ংদীপ্ত। তোমার যে একটা পারিবারিক জগৎ আছে, আমার কাছে সে প্রসঙ্গটা একেবারেই গৌণ ছিল তখন। তোমার মাথায় রক্তমাখা যে জয়মুকুট দেখেছি, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তার বেশি কোনো কিছুর প্রয়োজন আমার নেই।

বিয়ের পাট চুকল। অসীম, অলক, পার্থসারথি আর তোমাদের দলের একজন প্রাচীন কর্মী মুকুলেশবাবু সাক্ষী হয়ে সই করলেন। তারপর কাটলেট আর সন্দেশ খেয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন তাঁরা।

তখন তুমি আর আমি। স্বামী স্ত্রী। তুমি আমার দিকে চাইলে, আমি তোমার দিকে চাইলুম।

হাতব্যাগে করে ছোট এককৌটো সুগন্ধি সিঁদুর এনেছিলুম। সেইটে বের করে তোমায় দিয়ে বললুম, সিঁথিতে পরিয়ে দাও।

তুমি বললে, সিঁদুর? এ-সব কন্‌ভেন্‌শ্যন আমি মানি না।

বললুম, আমিও না। কিন্তু তুমি পরিয়ে দিলে আমার ভালো লাগবে। মনে হবে, আমাকে তুমি তোমার সঙ্গে পথ চলবার রক্ত-তিলক পরিয়ে দিলে!

তুমি হেসে বললে, রোম্যাণ্টিক? আচ্ছা—দাও।

তখন আমি তোমার গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলুম।

তুমি হেসে বললে, স্লেভারি!

বললুম, তা হোক। কিন্তু আমাকে আশীর্বাদ করলে না?

তুমি বললে, আমাদের আদর্শের জয় হোক।

আমার বুক ভরে গেল। এ ছাড়া আর কী-ই বা আশীর্বাদ করতে পারো তুমি!

বললে, এইবার চলো, একটা বাসে চেপে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া যাক।

বললুম, না—আজ ট্রাম-বাস নয়। আমার হাত-পা আজ আর চলতে চাইছে না। একটা ট্যাক্সি ডাকো।

হেসে বললে, কন্‌ভেন্‌শ্যনালি ট্যাক্সি চেপে শ্বশুরবাড়ীতে যেতে চাও? আমারও তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু ওদের সন্দেশ আর কাটলেট খাইয়ে পকেটে আনা ছয়েক পয়সা মাত্র আছে। ট্যাক্সি ভাড়া তাতে কুলোবে না।

আমি বললুম, টাকা আমি দেব। তুমি ডাকো ট্যাক্সি।

সেদিন ট্যাক্সি করে তোমার সঙ্গে যেতে যেতে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে চারদিকের পথঘাট মুছে গেল সামনে থেকে। রক্তের মধ্যে কান্না কাঁপতে লাগল, চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার মুখ, মনে পড়ল তাঁর কথা: 'কৃষ্ণা আমার মেয়ের মতো মেয়ে। ওরই আশায় আমি দিন গুণছি'। চোখের জল রুখতে পারলুম না। বাঁধন ছিঁড়তেই তো বেরিয়েছি, কিন্তু ছিঁড়তেও যে ব্যথা লাগে, অনেকগুলো যে একেবারে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে জড়ানো, এ কথা এর আগে তো এমন করে বুঝতে পারিনি।

তুমি আমার একখানা হাত টেনে নিলে মুঠোর ভেতর। গভীর স্বরে বললে, ভয় করছে কৃষ্ণা?

জবাব দিলুম, না। যেখানে তুমি আছো, সেখানে কোনো ভয়ই আমার নেই।

ট্যাক্সি গিয়ে পৌঁছুল শোভাবাজার অঞ্চলের একটা ছোট রাস্তায়। ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলো দূরে দূরে—কেমন একটা ঠাণ্ডা

অন্ধকার চারদিকে। কালো রঙের গলিটা সাপের পিঠের মতো ভিজে ভিজে; দু'ধারে পুরোনো বাড়ীর সার; আস্তর খসা, ইট-বেরুনো; কোথাও কাদের দেওয়ালে ড্রেনের-পাইপ ভাঙা, সেখান থেকে একটা চাপা দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে গলিময়। সব মিলে মনে হল, একশো বছর আগেকার পুরোনো কলকাতা এখানে স্থির-স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনি খটখট করে একটা জুড়ি গাড়ি বেরিয়ে আসবে কোথা থেকে, আর সেই গাড়ির যে সোয়ার তার গায়ের রেশমি আচকানে জরি জ্বলবে, গলায় চিক চিক করবে সোনার হার, আতরের উচ্ছ্বাস বিলিয়ে চলে যাবে সে আর গুণ গুণ করে গাইতে থাকবে রাম বসুর সখী সংবাদ!

তুমি আমার ঘোর ভাঙালে। বললে, এই বাড়ী।

—এই বাড়ী?—আমি চমকে চেয়ে দেখলুম। প্রকাণ্ড একটা তেতলা আমার সামনে—লম্বা ব্যারাকের মতো বাড়ীটা। দোতলার সারি সারি কাচের দরজায় আলো জ্বলছে—কোনো কোনোটায় রঙিন কাচ। তেতলার একটা বারান্দার রেলিং ধ্বসে পড়েছে খানিকটা। এক সময় বাড়ীটার রঙ বোধ হয় হলদে কিংবা সাদা ছিল, এখন অযত্নে অনাদরে ভূষো কালির মতো রঙ। মাঝে মাঝে আস্তর-ভাঙা দেওয়ালে হা-হা করছে ন্যাড়া ইট, একদিকে ছাতের ওপর বেশ বড়ো গোছের অশথের চারা মাথা নাড়ছে।

কেমন মৃত্যুপুরীর মতো মনে হল। দোতলার সারি সারি কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে রং-বেরঙের আলো কেমন যেন ভুতুড়ে বলে বোধ হতে লাগল, সারা শরীর শিউরে উঠল আমার।

ট্যাক্সিওয়ালা বললে, ভাড়াটা মিটিয়ে দিন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

আমি ব্যাগ খুলে ভাড়া দিলুম। ট্যাক্সি চলে গেল।

তখনো দাঁড়িয়ে আছি একভাবে। সামনেই একটা একতলায় জীর্ণ-শীর্ণ একটা কবিরাজী দোকান। ঘরে ইলেকট্রিক নেই, লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোয় কতগুলো কালো শিশি-বোতল চকচক করছে, আর একটি রোগা বুড়ো মানুষ খালি গায়ে একটা নীচু তক্তাপোশে বসে, নিকেলের ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। ঠাণ্ডা, মড়ার মতো সেই স্থির দৃষ্টিতে আর একবার আমার গা ছম ছম করে উঠল। মনে হল, লোকটি যেন এই প্রেত-প্রাসাদের কোনো অশরীরী প্রহরী।

তুমি বললে, এসো কৃষ্ণা।

নিঃশব্দে তোমাকে অনুসরণ করলুম। পা দিলুম আমার পতিগৃহে।

সামনে একটা আধো-অন্ধকার উঠোন। প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার সামনে কারা যেন ডাঁই ডাঁই বাসন মাজছে বসে বসে। একধারে ছাই-পাঁশ আবর্জনার পাহাড়। পুরোনো চূণ, স্যাঁৎসেতে উঠোন আর আবর্জনার গন্ধ।

বাসন মাজতে মাজতে কে একজন মহিলা ফিরে চাইলেন আমাদের দিকে।

—কে রে, বিশু নাকি ?

আমরা দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিলুম। তুমি থেমে দাঁড়িয়ে, মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলে, হ্যাঁ, রাঙা কাকিমা।

—সঙ্গে কে তোর ? কুমোরটুলীর নীলি নাকি ?

—না, নীলি নয়।

—তবে কে ও ? তাই তো, কোনোদিন তো দেখিনি একে।

তোমার মুখ একটা অদ্ভুত কৌতুকের হাসিতে ভরে উঠল : না দেখনি। কিন্তু এর পর থেকে রোজই দেখতে পাবে।

—সে আবার কী ?

—বিয়ে করে আনলুম রাঙা কাকিমা। আমার স্ত্রী।

ভদ্র মহিলা একা নন, আরো ছু-একজন সঙ্গে ছিলেন তাঁর। তিনজনই একসঙ্গে পাথর হয়ে গেলেন যেন।

—কী বললি ?

—ঠিকই বলেছি। আমার স্ত্রী।

ঝনাৎ করে একখানা ভারী কাঁসার থালা আছড়ে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ উঠল।

তুমি বললে, ওদিকে তাকিয়ো না কৃষ্ণা, ওপরে উঠে এসো।

ওপরে উঠে গেলুম। কিন্তু বুকের মধ্যে তখন ঝড় শুরু হয়েছে আমার। দেখলুম, একতলার কথাগুলো শুধু সেখানেই থমকে থামেনি, দোতলাতেও উঠে এসেছে। প্রত্যেকটি ঘর থেকে মুখ বেরিয়ে এসেছে মেয়েদের, কয়েকটি পুরুষও দাঁড়িয়ে পড়েছে এখানে ওখানে আর সব চোখগুলো আমার দিকেই স্থির হয়ে আছে।

একটি প্রৌঢ়া বিধবা এগিয়ে এলেন সামনে।

—একি বিশু !

—অবাক হওয়ার কিছু নেই জেঠিমা। আমি বিয়ে করে এসেছি।

—শেষে রাস্তা থেকে বৌ নিয়ে এলি বিশু ? মল্লিক বংশের ছেলে হয়ে—

—তোমাদের কারো উপদেশ তো আমি চাইনি—তুমি যেন বীরের মতো ছু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে রক্ষা করতে দাঁড়ালে : যাকে ভালো মনে করেছি, তাকেই বিয়ে করেছি।

—বেশ করেছিস বাছা !—প্রৌঢ়ার মুখে তীক্ষ্ণ হাসির ছুরির ঝলক জাগল : ভালো-ভালো। রতন নইলে আর রতন চেনে! বলি, হিন্দুর মেয়ে তো ? না ক্রেশ্চান-মোসলমান নিয়ে এলি ঘরে ?

দরজায় বেরুনো মুখগুলো থেকে খল খল করে হাসির ঝঙ্কার উঠল।

নীচে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বললে, শাঁখে ফুঁ দাও গো, কুলো-পিদ্দীম আনো। ছোট কত্তার ছেলে বিশু বৌ এনেছে, বরণ করে ঘরে তুলে নাও!

—বয়ে গেছে! আর একটি গলা খন খন করে ভেঙে পড়ল: কোন্ অজাত-কুজাত—

আমি একটা দেওয়াল ঘেঁষে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। তুমি আমার হাত চেপে ধরলে। দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, চলে এসো কৃষ্ণা, এরা সব সত্যযুগের ফসিল। এদের কথায় কান দিতে নেই।

নীচের সেই কোলাহল শুনতে শুনতে আমরা তেতলায় উঠলুম। একটা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে তুমি বললে, এসো ভেতরে।

আমি আমার স্বামীর ঘরে ঢুকলুম।

কোনো আশা নিয়ে তোমার ঘর করতে আসিনি বিশ্বজিৎ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমারও মন বলেছিল: 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'। তবু—তবু আমার দুর্বলতা তুমি ক্ষমা কোরো। আমি তো বাংলা দেশেরই মেয়ে। সব স্বপ্ন, সব মোহের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই তোমার কাছে এসেছিলুম। কিন্তু এত সহজেই কি কাটে এতদিনের সংস্কার? শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কে, স্বামীর ঘর সম্পর্কে একটা স্বপ্ন সব বাঙালী মেয়ের থাকেই। স্বামীকে ভালোবাসবার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবেশটাকেও মধুর রমণীয় করে গড়ে তুলতে চায়, যেন ছবির সঙ্গে তার ব্যাক-গ্রাউণ্ড!

অস্বীকার করব না—ধাক্কা একটা লাগল।

আর সেই সঙ্গে নতুন করে শ্রদ্ধা জাগল তোমার ওপর। দেখলুম তুমি কত বড়ো—কী পটভূমি থেকে উঠে এসে কোন্ আলোয় তুমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ। বুঝতে পারলুম, আমাদের চলতি জীবন,

আমাদের সমাজ, আমাদের চিরকেলে পারিবারিকতার ওপরে কেন তোমার এমন সীমাহীন ঘৃণা।

আশ্চর্য তোমাদের বাড়ী।

এককালে জমিদারী ছিল, ব্যবসাও নাকি ছিল। এখন ব্যবসা আর নেই, মারোয়াড়ীদের হাতে চলে গেছে। কিন্তু সাত আট খানা বাড়ী আছে এখনো, তা থেকে ভাড়া আসে। তোমাদের পরিবারের সাত শরিকের মধ্যে সেই ভাড়ার টাকা ভাগ হয়ে যায়। তা থেকে কেউ পায় দুশো আড়াই শো, কেউ পায় পঞ্চাশ ষাট। কেউ চাকরী বাকরী করে একটু সচ্ছল ভাবে থাকে, কারো বা দিন চলে না। তোমার ভাগে শ খানেক টাকা আসে। তুমি একা মানুষ, ভাই নেই, বোন নেই, বাবা নেই; থাকবার মধ্যে মা—তিনি পাঁচ বছর ধরে কাশীতে। একশো টাকা থেকে গোটা কুড়িক মা-কে পাঠাতে হয়, তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা সেজো কাকিমার সঙ্গে, তাঁদের গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে হয়; বাকী ত্রিশ টাকার মতো তোমার সম্বল।

আমি এলুম। প্রশ্ন জাগল, এখন কী হবে।

আনন্দে মুখ কালো করে সেজো কাকিমা সোজা কাজের কথায় এলেন।

—কিরে বিশু, আলাদা হেঁসেল হবে নাকি কাল থেকে?

—দাঁড়াও, দাঁড়াও— এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।

—একটু আগে থেকে জানালেই ভালো হয়, এই আর কি!

আমার সব ধাঁধার মতো ঠেকছিল, সব আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেজো কাকা মাতাল। রোজ সন্ধ্যে হলে গিলে-করা পাঞ্জাবী চড়িয়ে বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত একটায় এবং সচেতন ভাবে

ফেরেন না। প্রায়ই রাস্তা থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে আনতে হয় তাঁকে। তাঁদের মদের খরচ জোটাতে ভাগের টাকা সাত দিনে শেষ হয়ে আসে, সেজো কাকিমা প্রাণপণে এদিক-ওদিক কিছু লুকিয়ে রাখেন!

তাঁর দুর্ভাবনার কারণটা জলের মতো স্পষ্ট।

কিন্তু ভাবনা অন্য জায়গাতেও। পঞ্চাশ টাকাতে দু-জনের খোরাক তিনি কেমন করে চালাবেন?

তুমি প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষ, কোনো কথা গোপন করলে না। আমাদের সেই বিয়ের রাত্রিতে, তোমার তেতলার সেই চূণ বালি-খসা, বইপত্রে ভরা, আলনায় আধময়লা জামা কাপড় ঝোলানো আর দেওয়ালে কার একখানা মস্ত পুরোনো অয়েল-পেন্টিংওয়ালা ঘরে সব কাহিনী শুনতে শুনতে প্রায় বিনিদ্র রাত আমার কেটে গেল। কোথায় পেটা ঘড়ি বাজছিল: একটা-দুটো-তিনটে। আমাদের নিয়ে একতলা দোতলায় যে কল-কাকলী চলছিল সেটা যে কখন থেমে গেছে, আমি টেরও পাইনি।

তুমি ঘুমিয়ে পড়লে কথা কইতে কইতে, সারাদিনের ক্লান্তি আর উত্তেজনায় কখন তোমার গলার স্বর জড়িয়ে থেমে গেল, শুধু শুনতে পেলুম তোমার শ্রান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ। আমি কান পেতে শুনতে লাগলুম দূরে দূরে কাদের যেন ভারী জুতোর আওয়াজ—খুব সম্ভব পুলিশ, ইঁদুরের আনাগোনার আওয়াজ, এক আধটা মোটর গাড়ীর চলে যাওয়া, শ্মশান যাত্রার হরিধ্বনি, গঙ্গার বুক থেকে স্ট্রিমার আর জাহাজের বাঁশির শব্দ।

শেষ রাতে জানলার ভেতর দিয়ে আকাশ যখন ফিকে, তখন গরাদে ধরে বাইরে চাইলুম। সামনে একটা চারতলার মাথায় চিলে কোঠাটা সব আকাশ আড়াল করে দিয়েছে। মনে হল, এইটেই

পুব দিক—কিন্তু ওই চারতলা আর চিলেকোঠার বাধা পার হয়ে এখানে কি সূর্যের আলো এসে পড়বে কখনো ?

তুমি নড়ে উঠলে। হাই তুললে একটা। জড়ানো গলায় বললে, কৃষ্ণা, ঘুমোওনি ?

সংক্ষেপে বললুম, ভোর হয়েছে।

—ক'টা ?

—প্রায় পাঁচটা বাজে।

—উঃ, কী দারুণ আর্লি-রাইজার তুমি ! আমার তো আটটার আগে সকাল হয় না।

নিরুত্তরে আমি হাসলুম। তুমি দু-হাত বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে ঃ কাছে এসো।

অনেকক্ষণ দু-হাতে ছেলেমানুষের মতো আমার কোমর জড়িয়ে পড়ে রইলে তুমি, আমি ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম তোমার মাথায়। মনে হতে লাগল, এখন তুমি কত অসহায়, কত করুণ। এই দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড বনেদী বাড়ীটায়, ভাঙন-ধরা ঐশ্বর্যের শেষ পর্যায়ে কতগুলো ভাঙ্গাচূরো মানুষের ভেতর কী একা—কী বিষণ্ণ দিন তোমার কাটে। যোদ্ধা তুমি, তুমি সৈনিক, অথচ তোমার জন্যে এতটুকু শিবিরের শান্তি নেই কোথাও—এতটুকু আশ্রয় এরা কেউ তোমার জন্যে মেলে রাখেনি !

তুমি বললে, খুব মন খারাপ হয়ে গেছে—না কৃষ্ণা ?

—না-না, কেন মন খারাপ হবে ?

—এদের অশিক্ষা কুসংস্কার, নীচু মন—

—তার জন্যে রাগ করব কেন ? তোমার কাছ থেকেই তো জেনেছি এরা এই সমাজের নিশ্চিত পরিণাম, এরা ইতিহাসের ট্র্যাজেডী। রাগ করব কেন. এদের জাগিয়ে তুলব।

তুমি একটু হাসলে।

—থিয়োরীর দিক থেকে কথাটা ঠিক। কিন্তু কৃষ্ণা—জাগানো যায় তাদেরই যারা ঘুমিয়ে আছে ; তাদেরই বাঁচানো চলে যাদের শরীরে রক্ত বইছে এখনো। কিন্তু কী করবে তুমি মমিকে ? এদের ইতিহাসের যাত্নঘরে সাজিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না।

আমি চমকে উঠলুম। দরজার খড়খড়িতে যেন খুট্‌খুট্‌ করে আওয়াজ উঠল একটু। কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে মনে হল।

বললুম, ওকি !

তোমার মুখ ঘৃণায় কালো হয়ে উঠল। বললে, বুঝতে পারছ না ? বাসরঘরে আড়ি পাতছে। যত সব মধ্যযুগের ভাল্‌গারিটি—পজিটিভ নুইসেন্স !—গলা চড়িয়ে ডাক দিলে ঃ কে—কে রে দরজার বাইরে ?

তুড়দাড় করে কতগুলো পায়ের আওয়াজ। চুড়ি আর শাড়ীর শব্দ —কয়েকটি কিশোরী গলার খিলখিল হাসি।

—দেখলে তো ?

আমি হাসলুম। জবাব দিলুম না। সত্যি কথা বলতে কি, আড়ি পাতার ব্যাপারটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগল না। বরং মনে হল, আমাদের এই অস্বাভাবিক বিয়েটাকে যেন এর মধ্য দিয়ে খানিকটা স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করে নিয়েছে এরা।

কিন্তু বিশ্বজিৎ, তিন-চারদিন না যেতেই মনের আকাশটায় যেন অন্ধকার ঘনাতে লাগল।

সেই রাত্রেই মেয়েদের কিছু কিছু দেখেছিলুম, আস্তে আস্তে পুরুষদের দেখলুম। কী দেখলুম, সে না বলাই ভালো। দোষ আমি কাউকে দিই না—পূর্ব পুরুষের ঐশ্বর্যের আলোটা নিভে

গেলে যে ছাই পড়ে থাকে, তার চেহারা কখনো সুখের হয় না। ঈর্ষা, তুচ্ছতা, লোভ, দীনতা। সবাই হুঁশিয়ার, স্বার্থের ব্যাপারে শেয়ালের মতো ধূর্ত—আত্মবিস্মৃতিতে শিশুর মতো নির্বোধ। আজও বাড়ীর কিশোরী তরুণীদের স্কুলে-কলেজে পাঠাতে আপত্তি—পাছে লোকের নজর পড়ে, পাছে খারাপ হয়ে যায়! বিদ্যাসাগরের আগের যুগ এখনো একটা পরিবারের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে পারে—চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না, মনে করতুম রূপকথা শুনছি।

কিন্তু ফল কী হয়েছে ?

স্কুলের সেভেন-এইট পর্যন্ত দৌড়। তারপর বাড়ীতে বসে থাকা সিনেমার গান গাওয়া, বৌদি-কাকিমার বিবাহিত জীবনের গল্প শোনা, এবং—

এবং আর বলতে পারব না। কলম থেমে আসছে আমার।

বিয়ের পরে বাবাকে চিঠি লিখেছিলুম একখানা, জানতুম জবাব পাবনা। কিন্তু আশ্চর্য, চিঠি এল। আমি আশীর্বাদ চাইনি, তবু অভিমান রাখতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। পোস্টকার্ডে দু-ছত্র লিখেছেন কেবল ঃ যাহা ভালো বুঝিয়াছ তাহাই করিয়াছ। তোমার স্বামীর ঘর সুখের হউক।'

আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তুমি এলে। বললে, কা'র চিঠি ?

—বাবার।

—খুব গালমন্দ করেছেন তো ? ওল্ড ফসিল !

আমাকে ক্ষমা করো, তোমাকে আমার খুব খারাপ লাগল তখন। একটা তীব্র প্রতিবাদ ফেনিয়ে উঠল বুকের ভেতর, এগিয়ে এল মুখের

কাছে। কিন্তু আমি বললুম, না গালমন্দ করেন নি। বলেছেন, আমার স্বামীর ঘর সুখের হোক।

—তাই নাকি? —তুমি একটু হেসে পোস্টকার্ডটা তুলে নিলে: দেন দ্যাট ওলড্‌ম্যান ইজ এ বিট রিজনেবল! ভেরী গুড! তা ওঁকে বলো না আমাদের মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাতে—অনেক প্রব্‌লেম সল্‌ভ্‌ড্‌ হয়ে যায়।

জ্বলন্ত চোখে আমি বললুম না, ওঁর টাকা আমি নিতে পারব না। তুমি ভেব না, একটা ব্যবস্থা হবেই!

পাঁচ

পরদিন বিকেলেই দেখা হয়ে গেল রমাপতিবাবুর সঙ্গে। তুমি বেরিয়ে গেছ, বিকেলের দিকটায় তোমার কয়েকটা খুঁটিনাটি জিনিস কেনবার জন্যে আমি এসেছিলুম কলেজ স্ট্রীটে। ভেবেছিলুম, হস্টেলে একবার মীরার কাছেও যাব, বিয়ের পরে ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

অন্যমনস্ক হয়ে চলেছিলুম। নানা চিন্তা ঘুরছে মনে। ও বাড়ীতে যতই খারাপ লাগুক, আমার তুমি আছো, তোমাকে নিয়ে বাস করছি আমার বিচ্ছিন্নতার নির্জন দুর্গে। বাড়ীর বিষের হাওয়া সেখানে পৌঁছোয় না। আমার চিন্তা অন্য জায়গায়। দুজনের খরচ চলবে কী করে? কলেজের পড়াটাও ছাড়া উচিত হচ্ছে না, একটা রোজ-গারের ব্যবস্থা করাই চাই। কিন্তু কী ভাবে?

ঃ কৃষ্ণা!

চমকে থেমে দাঁড়ালুম। বাবার বন্ধু, আমার লোক্যাল গার্ডিয়ান রমাপতিবাবু। কাছে এগিয়ে এলেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন আমার সিঁদুরে রাঙা সিঁথির দিকে। কোনো মন্তব্য করলেন না, শুধু বললেন, ভালো আছো?

—আছি কাকা।—মাথা নামিয়েই জবাব দিলুম আমি।

—কোনো চিঠি পেয়েছ প্রভাংশুর?

প্রভাংশু বাবার নাম। মাথা হেলিয়ে বললুম, পেয়েছি।

কিন্তু চোখে আবার জল এসে গেল। এই দুর্বলতাটাই কোনোমতে আমি কাটিয়ে উঠতে পারছি না এখনো।

—কোথায় চলেছ ?—রমাপতিকাকা আবার জিজ্ঞেস করলেন : খুব ব্যস্ত আছো এখন ?

—না কাকা, তেমন কিছু কাজ—

—তাহলে একবার এসো আমার বাসায়। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

রমাপতিকাকার বাসা কাছেই, কলেজ রো-এ। আগে বাবার সঙ্গে সেখানে আমি গেছি। আমি একবার দ্বিধা করলুম, যাওয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারলুম না, তারপর বললুম, চলুন।

বাড়ীতে এসে পা দিলুম। রমাপতিবাবু আমাকে বাইরের বৈঠকখানায় বসালেন। আমি বুঝতে পারলুম, আর তিনি আমায় তাঁর দোতলায় যেতে বলবেন না, আর কাকিমা দেখা করবেন না আমার সঙ্গে, ওঁদের জীবন থেকে আমি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছি এখন।

আমাকে বসিয়ে রমাপতি কাকা ভেতরে গেলেন। একবার যেন চাপা গলার স্বর শুনতে পেলুম কাকিমার। তারপরেই যেন রমাপতি কাকা বললেন, থাক—থাক—চুপ করো।

ভাবছিলুম, না এলেই ভালো হত, এক্ষুণি বেরিয়ে যাই ঘর থেকে, এমন সময় রমাপতিবাবু ফিরলেন। একটা চেয়ার টেনে বসলেন আমার মুখোমুখি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মীরার কাছে তোমাদের বিয়ের খবর পেয়েছি। একদিক থেকে ভালোই করেছ, নানা আলোচনা উঠছিল, এ ভালোই হল তার চেয়ে।

একটুখানি প্রশ্রয় দিলেন যেন। আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। আমি এ টুকুও আশা করিনি ওঁর কাছ থেকে।

রমাপতিকাকা বললেন, কিন্তু বিয়ে করলে বলে পড়াটা ছাড়লে কেন ?

—ছাড়তে চাই না স্যার। কোন সুবিধে মতো চাকরি খুঁজছি মর্ণিং স্কুলে। পেলে আবার পড়তে পারি। নইলে—একবার ইতস্তত করলুম : আপনার ছাত্রের যে অবস্থা—

রমাপতি কাকা ভ্রূকুটি করলেন : এইটেই অন্যায়। নিজেদের একটা দাঁড়ানোর ব্যবস্থা না করে ফস্ করে বিয়ে করে ফেলাটা—একটু থেমে বললেন : চাকরি পেলে পড়াটা চালাতে পারো, না ?

—পারব স্যার।

—আমি বোধ হয় একটা জোগাড় করিতে পারি। জানো তো, দু-তিনটে মেয়েদের স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছি। কিন্তু তুমি তো আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট—গোটা ষাটেকের বেশি বোধ হয় পাবে না।

—ষাট টাকাই আমার পক্ষে যথেষ্ট স্যার।

—কিন্তু তুমি নিতে পারবে না চাকরিটা।

—কেন স্যার ?

—হস্টেলের চার্জ নিতে হবে এর সঙ্গে। অবশ্য তাতে লাভ হবে, থাকা-খাওয়ার খরচা কিছু লাগবে না, গোটা কুড়িক টাকা বাড়তি অ্যালাউন্স পাবে। কিন্তু দুটো অসুবিধা হবে তোমার। এক নম্বর—স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হবে, দু নম্বর, পলিটিক্স্ করাটা একেবারেই চলবে না।

যতটা খুশি হয়ে উঠেছিলুম, ততখানিই নিভে গেলুম আমি। হৃৎপিণ্ডটা শূন্যে উঠে এসেছিল অনেকখানি, ধপাস্ করে আছড়ে পড়ল আবার। নাঃ—এ অসম্ভব !

কি বলো কৃষ্ণা ?—কাকা আবার তীক্ষ্ণ চোখে আমার মুখের দিকে চাইলেন।

এই সময় চাকর চা আর খাবার নিয়ে এল কিছু ! আগে যতবার গেছি, শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে কাকিমা আদর করে আমায়

খাইয়েছেন, রমাপতি বাবুর মেয়ে মঞ্জু চেপে ধরেছে আমাকে ঃ কৃষ্ণাদি, একটুখানি লজিক বুঝিয়ে দিন না? আজ সব অন্য রকম। মঞ্জুর কোনো সাড়া নেই। হয়তো আমার ভয়েই ছাতে বা আর কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে, আমি এখন ওদের কাছে দস্তুরমতো সংক্রামক।

খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। কিন্তু না খেলে আরো খারাপ দেখায়। খানিকটা খেতে হল বই কি, কিন্তু যেন গলায় গিয়ে শক্ত হয়ে আটকে রইল।

রমাপতি কাকা আবার বললেন, কি বলো?

বললুম, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাল পরশু তরশু—দিন সাতেকের মধ্যে একটা কিছু আমায় জানালেই চলবে।

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে নিয়ে চলে এলুম। মনে হল, আমাদের ঔদ্ধত্যের পাশে কত স্নেহ আছে এখনো, কত ক্ষমা! বাবা চিঠি দিয়েছেন, রমাপতি কাকা চাকরি দিতে চাইছেন। কেমন যেন অপরাধী বোধ হচ্ছিল নিজেকে।

কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও জানি, এ চাকরি নিতে পারব না। এ শর্ত মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

আজ আমার তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা দরকার। যদি ও বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়, তোমার হাত ধরেই আসব আমি। আর পলিটিক্স্? তোমার ব্রতচারিণী হয়ে তোমার ব্রত ছেড়ে দেব এ অসম্ভবও কি সম্ভব?

বাড়ী ফিরে দেখি, ঘর সরগরম। অনেকে এসেছে। অসীম আছে, নীরদ আছে, কল্যাণবাবু আছেন। দারুণ উত্তেজিত আলোচনা চলেছে।

অসীম বললে, কী খবর? কোথায় গিয়েছিলে বৌদি?

এতদিন কৃষ্ণা বলত, বিয়ের পরে বৌদির সম্মান দিয়েছে।

বললুম, কয়েকটা টুকিটাকি কেনবার ছিল।

নীরদ হেসে বললে আমাদের একেবারে ভুলেই গেলেন কৃষ্ণাদি?

—তোমাদের ভুলব কেন ভাই? তোমরাই তো খোঁজ-খবর নাও না।

তুমি বললে একবার সেজো কাকিমার ওখানে খবর নাও তো কৃষ্ণা। চা করতে বলেছিলুম, দেখো তো কতদূর হল।

সেজো কাকিমার রান্নাঘরের সামনে গিয়ে পা থমকে গেল। পেয়ালায় চা ঢালছেন আর সমানে গজ গজ করে বকে চলেছেন: মোটে তো পঞ্চাশটি টাকা ঠেকিয়ে দিয়েছে, তাতে ছুজনের খোরাক, গুষ্টির চা—এসব আসে কোত্থেকে? আর বিয়েও করে আনল কোত্থেকে এক কালো ঢ্যাঙা বৌকে—রাতদিন নবাবকন্থা হয় বই পড়ছেন, নইলে—

জবাব দিতে পারতুম। বলতে পারতুম: 'রান্না ঘরে তোমরাই আমায় আসতে দাও নি, সাহায্য করতে যখন চেয়েছিলুম, তখন ভালোমানুষি করে বলেছ, বিয়ের পরেই নতুন বৌ এসে হেঁশেল ঠেলবে কিগো, সেটা কি ভালো দেখায়? আর এখন পাল্‌টা দোষ চাপাচ্ছ আমার ঘাড়ে। চমৎকার।'

কিন্তু কিছুই বললুম না। সেজো কাকিমা আমাকে দেখবার আগেই দরজা থেকে সরে এলুম নিঃশব্দে, তোমাকে এসে খবর দিলুম: চা আসছে।

—আচ্ছা—বলে আবার আলোচনায় তলিয়ে গেলে তোমরা।

আমি অনিশ্চিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। তোমরা কেউ আমায় বসতে বললে না, আলোচনায় যোগ দিতেও ডাকলে না। হঠাৎ মনে হল আমি যেন তোমাদের প্রয়োজনের কাছ থেকে

একেবারেই ফুরিয়ে গেছি। একদিন তোমাদের সব জরুরি আলোচনায় আমি অপরিহার্য ছিলুম, আজ আমাকে বাদ দিয়েও তোমাদের চলতে পারে। হয়তো আমি না থাকলেই তোমরা খুশি হও।

আহত অভিমান ফুঁসে উঠল বুকের ভেতর। নিঃশব্দে আমি চলে গেলুম ওখান থেকে। তোমার ঘরের ডান দিকে যে সংকীর্ণ বারান্দা, সব মিলিয়ে হাত পাঁচ-ছয় জায়গা, সব সময় জলের বালতি থাকে বলে ভিজে আর পেছল, সেইখানটিতে এসে রেলিং ধরে আমি দাঁড়ালুম। ঘর থেকে তোমাদের গলার আওয়াজ আসছিল, শুনেও শুনতে চাইলুম না।

এক ফালি উত্তরের আকাশ, সপ্তর্ষির দেখা যায় খানিকটা। সামনের বাড়ীর ছাতে গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কটার ওপর বসে কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছিল। একটি ছোট ছেলে কোথায় চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছিল, দুটি মহিলা ঝগড়া করছিলেন, কাদের রান্নাঘর থেকে মেথি-পোড়ার মতো কী যেন উগ্র গন্ধ আসছিল একটা। অন্যমনস্ক হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, বাবার কথা মনে পড়তে লাগল, মনে পড়ল আমাদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঝাউগাছ দুটোতে শোঁ শোঁ করে হাওয়া দিয়েছে এখন, পিসিমা বাবার ঘরে চা দিয়ে গেলেন, বাবা একমনে পড়ছেন—

পড়ছেন? আমার কথা ভাবছেন না একবারও?

—কৃষ্ণা—কৃষ্ণা—

চমকে উঠলুম। তুমি ডাকছ আমাকে।

ঘরে আসতে বললে, কোথায় গিয়েছিলে? দশ মিনিট ধরে খুঁজছি তোমাকে।

—বারান্দায় ছিলুম।

দেখলুম, ওরা সবাই কখন চলে গেছে। তুমি বললে, শোনো, আমাকে স্যুটকেস্ গুছিয়ে দাও একটা।

—কী ব্যাপার ? কোথায় যাবে ?

—অত্যন্ত জরুরী কাজ। আজ রাতেই দিল্লী না গেলে নয়।

—দিল্লী ?

—হ্যাঁ, টেলিগ্রাম এসেছে। কয়েকটা দরকারী ডিসিশন নিতে হবে।

আমার রক্ত যেন থেমে যেতে চাইল। তুমি থাকবে না, অথচ এ বাড়ীতে একা থাকতে হবে আমায়। এই প্রেতপুরীর মতো বাড়ীতে—যেখানে অপচ্ছায়ার মতো মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি যাদের ভালো করে চিনি না—জানি না, যারা কেউ আমাকে চায় না, বাস করতে হবে তাদের ভেতর! কেমন করে আমি থাকব এখানে। তুমি আমার পাথরের আড়াল, আমার দুর্গ, তুমি চলে গেলে এই বাড়ীর যত হিংসা, যত দীনতা, যত অন্ধকার, তাদের হাত থেকে কে রক্ষা করবে আমাকে!

সেজ কাকিমা ? একমাত্র তাঁকেই বিশ্বাস করেছিলুম খানিকটা। কিন্তু তাঁরও মনের চেহারা আমি আজ দেখতে পেয়েছি।

বললুম, আমি একা থাকব ?

—কোনো ভয় নেই কৃষ্ণা।

—কিন্তু এঁরা যে—

—এরা প্যাঁচা। আলো সইতে পারে না। নিজেরা চোখ বুজে থাকবে, কিন্তু আলোর তাতে কিছু আসে যায় না।

উপমা দিয়ে বললে। কথাটা শুনতে ভালো লাগল। কিন্তু মনের মধ্যে জোর খুঁজে পেলুম না।

—কবে ফিরবে তুমি ?

—সাত আটদিন পরে।

—সাত-আটদিন!

তুমি দু-হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলে আমাকে। আদর করলে

অনেকক্ষণ। ঘরে-ফেরা পাখির মতো সমস্ত মন আমার জুড়িয়ে গেল। কিন্তু রক্তের ভেতর ভয়টা তো পোষ মানে না।

—আমার ভালো লাগছে না একেবারে।

—ভালো কি আমারই লাগছে? তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে, সে কি বুঝতে পারছ না? কিন্তু উপায় কী, বলো। কাজের ডাক এসেছে, নিজের কথা ভাবলে তো চলবে না।

জানি। তোমাকে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদকেও মেনে নিয়েছি। মনে মনে বলেছি, 'এতো মালা নয় গো, এযে তোমার তরবারি, জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্র হেন ভারী।' তবু—তবু যেন জোর খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু এই বাড়ীর মানুষগুলো যদি অন্যরকম হত—যদি স্বাভাবিক হত! তুমি বাংলা দেশের নিতান্ত গরিব কৃষাণের ছেলে হলেও তোমার ভাঙা কুটিরে এর চাইতে ঢের বেশী শান্তি আমি পেতুম, অনেক সহজে মানিয়ে নিতে পারতুম নিজেকে।

তুমি বললে, কৃষ্ণা, তুমি আমার প্রলয় পথের সঙ্গিনী। এদের সাধ্য কি তোমায় স্পর্শ করে।

সেই রাত্রেই তুমি দিল্লী চলে গেলে। আর সেই রাত্রেই আমার জীবনে আবার ঝোড়ো মেঘ ঘনিয়ে এল।

পরের দিন নয়, তারও পরের দিন।

সকালে উঠেই দোতলার একটি ঘর থেকে দানবীয় কলহের আওয়াজ শুনতে পেলুম। আমার কোনো এক শ্বশুর—রেসের মাঠে যিনি প্রতি শনিবারে ভাগ্য ফেরাতে চান, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য আলাপ করছেন।

আলাপের পর্দা চড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। তারপর—

তারপর স্ত্রীর গায়ে হাত তুললেন ভদ্রলোক। কিল, চড় এবং লাথি।

আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলুম। কিন্তু খানিক পরেই অমানুষিক ভয়ের চমকে ছুটে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। মেয়েদের মিলিত গলায় আর্তনাদ উঠল—'খুন—খুন—' আর পুরুষের মোটা গলা গর্জাতে লাগল : 'চুপ—চুপ—চুপ —'

বাড়ী নিথর হয়ে গেল। পিন পড়লে শোনা যায় এমনি স্তব্ধতা !

আমার সেই শাশুড়ী সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়েছেন কয়েক ধাপ। রক্তে ভাসছে শরীর। খিঁচুনি উঠেছে হাতে পায়ে। মাথার চুলগুলি যেন ছড়িয়ে গেছে ঝড়ের ঝাপটায়।

মা হতে চলেছিলেন। স্বামীর লাথিতে সে সাধ তাঁর মিটল। বাঁচবেন কিনা কেউ জানে না।

কে একজন চাপা গলায় বললে, খবর দাও—ডাক্তারকে খবর দাও—

তারপরে কি হয়েছিল জানি না। আমি মাথা ঘুরে বারান্দার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলুম।

আমার সেই শাশুড়ি মরলেন না। এ বাড়ীতে আসবার আগেই এ-সব মৃত্যু আর অপঘাতকে জয় করে এসেছেন। তিলে তিলে যেখানে মরতে হবে, সেখানে এত সহজে কি নিষ্কৃতি পেলে তাঁর চলে।

আর আমার সেই ননদ নিরুপমা। যাকে বাড়ীতে তোমরা ডাকতে পোকা বলে। লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের 'স্বভাব-চরিত্তির বিগড়ে যায়'—আজও এই 'মটো' তোমাদের বাড়ীতে চলে। এখানে মেয়েদের কাছে আজো সরস্বতী গাউন-পরা মেম-সাহেবের মতো ভয়াবহ। অতএব পোকাও লেখাপড়া করেনি, 'চরিত্তির' ভালো রাখবার জন্য বোধ হয় প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েই ও পাঠ মিটিয়েছে।

রঙে আর গয়নায় মেয়ে পার হয়ে যাবে—পোকার মা বলতেন। তা তিনি বলতে পারেন, কারণ শরিকদের ভেতরে তার অবস্থাই

সবচেয়ে ভালো। আমার সেই শ্বশুর কোন্ সাহেব কোম্পানির বড় বাবু। কোঁচা দেওয়া ধুতির ওপর সার্ট গুঁজে, কোটের পকেটে রুপোর পানের ডিবে নিয়ে তিনি জুতো খচমচিয়ে অফিসে যেতেন। উপরি-পাওনাও নাকি তাঁর অঢেল, সে খবর এ বাড়ীতেই আমি পেয়েছিলুম।

তোমাদের বনেদি পরিবারে গায়ের রঙ ধবধবে সাদা হলেই মেয়ে খাঁটি সোনা। পোকার তা ছিল। বাপের পয়সা থাকলে তা হল সোনার সঙ্গে হীরের কাজ। পোকার বাবার পয়সাও ছিল।

কিন্তু চব্বিশ পঁচিশ বছরে পা দিয়েও পোকার বিয়ে হয়নি। মেয়ে দেখে গেছে অনেকবার, গায়ের রঙ আসল না পোঁচড়া দেওয়া তা-ও আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে পরীক্ষা করে দেখেছে। তবে কারুর পছন্দ হয়নি। কথা হল, তোমাদের পাড়ার গলিতে পুরোনো কলকাতা মুখ থুবড়ে পড়ে থাক, তোমাদের বাড়ীতে একশো বছর আগেকার সমাজ একটা থুড়থুড়ে বুড়ীর মতো ঘাপটি মেরেই বসে থাকুক—পৃথিবী যে বদলে গেছে তুমি ছাড়া আর কেউ-ই সে খবর রাখত না। মেয়ে যারা দেখতে আসত, পোকার মুখের দু-একটা কথা শুনেই সেই যে তারা ছিটকে বেরিয়ে গেছে, আর ফেরেনি।

পোকার মন জাগেনি, কিন্তু শরীর জেগে ছিল। এ বাড়ীতে ওটা জাগতে তো সময় লাগে না। তার ওপর হিন্দী ফিল্ম আছে, পাড়ায় বিশেষ ধরনের ছেলে আছে। এই ছেলেরা ঠিক মেয়েকে চিনে নেয়। বিয়ে হোক আর নাই-হোক, বোম্বাই-মার্কা ফিল্মের মতো পোকার নাটকও জমে উঠেছিল।

তোমরা পুরুষ মানুষ—কোনোদিন খেয়াল করোনি, করবার কথাও নয়। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা ঠিক টের পেয়েছিল। দু তিন দিন

পোকার মা-কে চাপা গলায় ধমকাতে শুনেছি 'হারামজাদী' আবার যদি ছাদে গিয়ে দাঁড়াবি তো মুখ ভেঙে দেব।

পোকা কাঁদো কাঁদো হয়ে গুনগুনিয়ে বলত : 'কেন তুমি আমায় সন্দো করছ মা, আমি কিচ্ছু জানিনে।'

—'চুপ কর শতেকখোয়ারী, আর ন্যাকামো করতে হবে না। আমরা তো আর চাল সেদ্ধ করে খেতে জানিনে। তুই যদি ফের ছাদে যাবি কোনোদিন—'

পোকা তবুও ছাদে যেত—লুকিয়ে লুকিয়ে যেত ঠিক দুপুর বেলায়। যখন কর্তারা বাইরে, আর খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েদের দিবা-নিদ্রা চলছে। তোমার ঘরের পাশ দিয়েই তো ছাদে যাবার সিঁড়ি। আমি কতদিন দেখেছি, পা টিপে টিপে সে ওপরে উঠছে, আড় চোখে এই ঘরটার দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। আমাকে সে বিশেষ ভয় পেত না, ভাবত আমি কিছুই জানি না, ভাবত আমি এই বাড়ীর কেউ নই—নেহাৎই বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। তবুও সাবধানী চোখে সে চেয়ে চেয়ে দেখত এ-দিকে, চোরের মন যাবে কোথায়!

তারপর সেইদিন।

কিছুই ঘটত না—যদি না একটুখানি পেটের গোলমালের জন্যে পোকার দাদা নীলু সেদিন অফিসে না যেত, আর নীলু যদি না দেখত যে একটা বড়ো লাল রঙের কাটা ঘুড়ি টাল খেতে খেতে বাড়ীর ছাদে এসে পড়েছে।

ও-সময় ছাদে কেউ যায় না, কোনোদিন যায়ওনি। আজ নীলু গেল। আর লাল ঘুড়ির চাইতেও বড়ো জিনিস ধরে ফেলল ভাঙা-চুরো কিছু ফার্ণিচার ডাঁইকরা ফাটলধরা চিলেকুঠরির ভেতর।

নীলু জিমন্যাস্টিক করে থাকে, পাড়ার তাসা পার্টিতে ড্রাম

বাজায়। কয়েকটা কিল-চড় খেয়ে পোকা ঘরে এসে দোর দিল, তারপর ছোকরাটাকে একতলার উঠোনে টেনে এনে সেকি চোরের মার!

নাটক শেষ হল, ছেলেটাকে ফেলে দেওয়া হল রাস্তায়। তখন তার জামা টুকবো টুকবো, রক্ত গড়াচ্ছে দু'কষে, কাটা পাঁঠার মতো ছট্‌ফট্‌ করছে সে। নীলু ছিল, একতলার এক কাকাও ছিলেন—হাতের কাজে তাঁদের কোনো ত্রুটি হয়নি।

পোকার নিষ্কলঙ্ক 'চরিত্তির' ওপর থেকে ধুলোর মলিন প্রলেপটা কী নিপুণ ভাবেই মুছে ফেলা হল।

আর শুধু আমিই নিজের ঘরে পাথর হয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু আমি আর পারলুম না, বিশ্বজিৎ। আমার স্নায়ু ধৈর্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। তুমি নেই, কে আমায় আশ্রয় দেবে! এই জীবন্ত নরকের ভেতরে কোনখানে আমি নিঃশ্বাস ফেলব!

বিকেলে ছুটে গেলুম রমাপতি কাকার ওখানে।

—আমি চাকরিটা নেব কাকা। কালই ব্যবস্থা করে দিন।

—কালই?

—হ্যাঁ, কালই।

কালই হল না, আরো দিন তিনেক দেরী হল। এর মধ্যে দিল্লী থেকে এল তোমার পোস্টকার্ড। সাত আট দিন নয়, কুড়ি দিনের আগে তুমি ফিরতে পারবে না। হয়তো একবার বম্বেতে যেতেও হতে পারে। তাহলে—

দ্বিধার রেশটুকুও কেটে গেল। ভাবলুম আপাতত এ বাড়ীর হাত থেকে রক্ষা পাই, হস্টেলে গিয়ে উঠি, তারপর তুমি ফিরে এলে যা হওয়ার হবে। তুমি চাকরি করতে বললে করব, নইলে ছেড়ে

পালিয়ে আসব তৎক্ষণাৎ। কিন্তু তুমি ছাড়া মল্লিক বাড়ীতে একটা দিনও আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারব না!

সুটকেস্ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, সেজ কাকিমা বললেন, কোথায় চললে?

মিথ্যে করে বললুম, বালীগঞ্জে—বোনের বাড়ীতে। ক'দিন থাকব সেখানেই।

ঠাট্টা করে বললেন, তোমাদের আর কি, ডানা হয়েছে, উড়তে জানো, যখন খুশি আসবে যাবে। আমরাই চিরকাল খাঁচার পাখি হয়ে রইলুম, দরজা আর খুলল না।

কথাটার মধ্যে জ্বালা ছিল, দীর্ঘশ্বাসও ছিল হয়তো। হেসে বললুম দরজাটা নিজেই চেষ্টা করে খুলতে হয়, বাইরে থেকে কেউ খুলে দেয় না। দেখুন না পারেন কিনা।

জবাব এল: এ যাত্রা আর হল না বৌমা।

কেন জানিনা, সেজ কাকিমার জন্যে আমার মায়া হল।

সুটকেস্ নিয়ে, গলি পেরিয়ে যখন বাসে এসে উঠলুম, তখন চারদিক থেকে যেন বাতাসের ঝাপটা আমার গায়ে এসে লাগল, যেন আকাশ-ভরা আলো দু-চোখ মেলে দিয়ে আমার মুখের দিকে চাইল। এত আলো, এত হাওয়া আছে কলকাতায় এ-কথা এতদিন যেন আমার জানাও ছিল না। বাসের যে দিকটায় রোদ পড়েছে, ইচ্ছে করেই সেদিকে গিয়ে আমি বসলুম। রোদে চোখ-মুখ জ্বলছিল কিন্তু আমি অনুভব করছিলুম যেন অগ্নিস্নানে আমার সর্বাঙ্গ শুচি হয়ে যাচ্ছে।

অল্প বয়েসী বাস কণ্ডাক্টার এসে বললে, দিদি জানলাটা বন্ধ করে দেব কি? রোদ আসছে।

বললুম, না ভাই, থাক।

॥ ছয় ॥

স্কুলে যোগ দিয়েছি, হস্টেলে এসেছি।

স্কুল ঠিক কলকাতার ভেতরে নয়, বাইরে শহরতলীতেও নয়, আরো কিছু দূরে। বাসে করে ঘণ্টা খানেক পাড়ি দিয়ে আসতে হয়। বড়ো গঞ্জ, অনেক আড়তদারের আস্তানা। উদ্বাস্তুর উপনিবেশ গড়ে উঠে আরো বড় হয়ে উঠেছে জায়গাটা। আগে এই তল্লাটে এইটিই ছিল মেয়েদের একমাত্র হাইস্কুল—সেই সুবাদে হস্টেলও তৈরী হয়েছিল একটা।

রমাপতি কাকা এখানকারই লোক। খুব অবস্থাপন্ন পরিবার ওঁদের। অনেক টাকা ডোনেশন দিয়েছেন ওঁরা। সেই কারণেই স্কুলে ওদের দারুণ প্রভাব। আর তাইতেই এত সহজে চাকরিটা আমার জুটে গেল।

স্কুল সম্পর্কে একটু ভুল খবর দিলুম। শুধু মেয়েদেরই স্কুলই নয় এটা। একই বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের স্কুল হয়ে আসছে সেই প্রথম থেকেই। সকাল ছ'টা থেকে বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত মেয়েদের পালা। এগারোটা থেকে ছেলেদের শিফট্ শুরু হয়।

রমাপতি কাকা সব দিক ভেবে রেখেছিলেন। তু-দিন ন-টার পরে আমার আর ক্লাস থাকত না—এটুকু স্পেশাল অ্যাডভেণ্টজ আমায় দেওয়া হয়েছিল যাতে কলকাতায় এসে আমি কলেজে ক্লাস করতে পারি। যেদিন বারোটা নাগাদ কলেজ থাকে সেদিন একটু দেরী করেও আমি বেরুতে পারি—সাড়ে দশটা পর্যন্ত থাকতে পারি। মোটের ওপর রমাপতি কাকার দিক থেকে কোনো ত্রুটি ছিল না।

এখানে এসে বাবাকে চিঠি দিলুম, তোমাকে চিঠি দিলুম।

তোমার কাছে মাপ চেয়েছিলুম বারবার। বলেছিলুম, নিতান্ত সাময়িক ব্যবস্থা—তুমি এলে যা ভালো হয় করা যাবে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ দিন গেল, আর কোনো খবর নেই তোমার। হয়তো নানা জায়গায় ঘুরছ, আমার চিঠি পাওনি ; হয়তো বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিয়েছ, পড়ে আছে সেখানে। ছটফট করে ভাবলুম, একবার খবর নিতে হবে।

সেদিন আমি কলেজে গেলুম আবার। প্রায় একমাস পরে।

কলেজ শুদ্ধ্ ছেলেমেয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। গুঞ্জন উঠল নানা গলায়।

মীরা এসে জড়িয়ে ধরল দু হাতে।

—একেবারে ভুলে গেলি ভাই।

—তোদের ভুলতে পারি কখনো! সাধ্যি কি!

—বিশ্বজিৎদা কোথায় রে? সেও তো অনেক দিন আসেনা!

—দিল্লী গেছে একটু কাজে। ফিরতে দেরী হবে।

—ভালো আছিস তো? স্বামীর ঘর কেমন লাগছে?

মৃদু হেসে এড়িয়ে গেলুম. কোনো স্পষ্ট জবাব দিলুমনা ওর কথায়।

মীরা বললে, এখন থেকে নিয়মিত কলেজে আসবি তো?

—তাই তো ভাবছি।

—বিশ্বজিৎদা পারমিশন দেবে?

—কেন, হারেমে আছি নাকি?

মীরা হেসে বললে, কে জানে!

ক্লাসে প্রফেসারেরা পর্যন্ত সবাই যেন কেমন করে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। তোমার সঙ্গে আমার বেহিসেবী বিয়ের খবরটা সকলেরই জানা, হয়তো তাঁরাও কিছু জল্পনা-কল্পনা করেছেন তা নিয়ে।

আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম, কিছুতেই ভালো করে ক্লাসে মন দিতে পারলুমনা। যেন অচেনা জায়গায় এসে পড়েছি, এখানকার সঙ্গে মনের যোগটা আমার ছিঁড়ে গেছে।

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কি এমন করে মানুষ আলাদা হয়ে যায়? আশ্চর্য!

ছুটির পরে নীরদ এসে বললে, একবার ইউনিয়ন অফিসে যাবেন না কৃষ্ণাদি? অনেকদিন পরে তো এলেন।

—আজ থাক, একটু কাজ আছে।

—সবাই দেখতে চায় আপনাকে।

—নতুন করে দ্রষ্টব্য হলুম নাকি?—আমার বিরক্তি বোধ হল: যাব কাল-পরশু।

বেরিয়ে ভাবলুম, একবার তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে খবর নিয়ে আসি তোমার কোন চিঠিপত্র এল কিনা। কিন্তু কিছুতেই মনের দিক থেকে যেন জোর পেলুম না। কাকিমার সেই রক্তমাখা চেহারাটা দারুণ দুঃস্বপ্নের মতো তখন আমার চোখের সামনে ভাসছিল। মনে পড়ছিল, কলতলায় পড়ে গোঙাচ্ছে সেই ছেলেটা, জামা-কাপড় টুকরো টুকরো, ফেনা গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। বাড়ীটার চেহারা মনে করতেই সারা শরীর যেন কুঁকড়ে আসতে চাইল আতঙ্কে।

মীরা বললে, চল্ হস্টেলে, চা খেয়ে যাবি।

কিন্তু হস্টেলে যেতেও কেমন সংকোচ হচ্ছে। মেয়ের দল এসে দাঁড়াবে ভিড় করে। নানা প্রশ্ন করবে। জবাব দেবার মতো উৎসাহ নেই, কেমন আছি এ কথাও জোর করে বলতে পারবনা। আমাকে ক্ষমা কোরো বিশ্বজিৎ, এই আমি প্রথম নিজেকে কেমন পরাভূত বোধ করলুম।

মীরাকে বললুম, না রে, অনেক দূর যেতে হবে। আমাকে

আবার ওখানকার বোর্ডিংয়ের চার্জ নিতে হয়েছে। বিস্তর ঝঞ্ঝাট।

অসীম বেরিয়ে আসছিল। ডেকে বললুম, একটা কাজ করতে পারো?

অসীম বললে, হুকুম করলেই। তুমি আমাদের বৌদি এখন। আগে তোমাকে একটুখানি খুশি করবার জন্যে হনোলুলু-হণ্ডুরাস্‌পর্যন্ত দৌড়োতে রাজী ছিলুম, এখন প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।

হেসে বললুম, মনে রইল, কিন্তু আজকে অতটা দরকার নেই। শুধু একবার ও-বাড়ী গিয়ে খবর কোরো, আমার কোনো চিঠি আছে কিনা। থাকলে নিয়ে এসো। তোমাকে তো বাড়ীর সবাই চেনেন।

—তা চেনেন। স্কুলে হাফপ্যাণ্ট পরবার সময় থেকেই আমি বিশ্বজিৎদার চেলা। তুমি যদি মিনিট পঁচিশেক অপেক্ষা করো, তা হলে আমি খবর এনে দিতে পারি।

মীরা বললে, কৃষ্ণা, চল্‌—তা হলে হস্টেলেই যাই। অসীমবাবু সেখানেই যাবেন এখন।

অসীম হাসল: আপনাদের হস্টেলে? আমরা তার পাশের রাস্তা দিয়ে হাটলেই মেট্রন বিমলাদির চোখ গোল হয়ে যায়, ভাবেন, ওঁর হস্টেল শুদ্ধু মেয়ে বুঝি বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে এল! মাপ করবেন, ওখানে যেতে পারবনা।

বললুম, তা হলে এই চায়ের দোকানটাতেই বসছি আমরা। তুমি ঘুরে এসো চটপট।

—ঠিক পঁচিশ মিনিট।—একবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই অসীম বিদ্যুৎবেগে অফিস-ফেরৎ বোঝাই বাসের হ্যাণ্ডেল্‌ ধরে ঝুলে পড়ল। আমি আর মীরা চায়ের দোকানে ঢুকলুম। এটা কলেজের ছেলেদেরই প্রধান আড্ডা—আমাদের মতো বেপরোয়া

মেয়েও কেউ কেউ যায়। ঢুকতেই চেনা একদল তারস্বরে অভ্যর্থনা করল।

—কৃষ্ণাদি, বিয়ের খাওয়ায় আমরা ঠকেছি। আজ ছাড়ব না।

—তা আমাকে কেন? ধরো তোমাদের বিশ্বজিৎদা-কে।

—তাকে আর পাচ্ছি কোথায়? একমাস ধরে কলেজে তার দাড়ির ডগাটুকুও দেখবার জো নেই। তুমিই খাওয়াও।

—ব্যাগে যা আছে, বাসভাড়া বাদ দিয়ে তোমাদের চা-টোস্ট হতে পারে বড় জোর।

—তাই সই। টী-পার্টিটাই হয়ে যাক। পরে ডিনার আদায় করব বিশ্বজিৎদার কাছ থেকে।

বেশ ভালো লাগল, মনের গুমোট কেটে গেল অনেকখানি। প্রায় একমাস পরে হাসি-গল্পে আমি সহজ হয়ে উঠলুম। বাংলাদেশের তরুণ ছাত্রদের ভারী ভালো লাগে আমার। এত আন্তরিক, এত ইমোশ্যানাল! দুষ্টুবুদ্ধি, পাগলামি আছে বইকি—কিন্তু একটুখানি ওদের মনের কাছে আসতে পারলে কত সহজে আপন করে নেওয়া যায়। অনেক ক'টি মনই প্রতিভায় ঝকমক করছে। কিন্তু না পায় পড়াশুনোর সুযোগ, না মেটে তরুণ মনের এতটুকু দাবি, অভাব গ্লানি তিক্ততার ভেতরে শেষে পথ হারিয়ে যায়।

এক-এক মুঠো সোনার মতো ছেলেরা। অথচ আমরা তাদের কাজে লাগাতে জানিনা, ভাঙা কাঁচের মতো ধুলোয় ছড়িয়ে দিই! এত বড়ো অপচয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কি না জানিনা।

কতক্ষণ এই হঠাৎ-পাওয়া খুশির মধ্যে কেটেছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি, বাইরে থেকে হাতছানি দিয়ে অসীম ডাকছে আমাকে। ব্যাকুল হয়ে আমি তখুনি বেরিয়ে এলুম।

—কী, এসেছে:চিঠি ?

—না।

মনের মধ্যে যে আলোটা জ্বলে উঠেছিল, হঠাৎ যেন নিবে গেল সটা।

—ওঃ !

অসীম বললে, তোমার চিঠি আনতে যাওয়া এক ঝঞ্ঝাট বৌদি। মাগে তো তালিম দাওনি—গিয়ে নানা কৈফিয়ৎ। তুমি নাকি ।ালীগঞ্জে বোনের বাড়ী গেছ, তাহলে আমাকে পাঠালে কী করে— কাথায় তোমার সঙ্গে দেখা হল, কী করেই বা দেখা হল ইত্যাদি। যাই হোক অনেক কষ্টে একরকম ম্যানেজ করে চলে এসেছি।

একটু চুপ করে থেকে বললুম, আচ্ছা তোমাদের বিশ্বজিৎদার কানো চিঠি তোমরা পাওনি ?

—যাওয়ার পরে দু-লাইন একটা পোস্টকার্ড এসেছিল, ফিরতে দরী হবে—ব্যাস। আমরা তো বরং ভাবছিলুম, তোমার কাছেই খবর নেব একবার।

—না, আমিও সেই দু-লাইন চিঠি ছাড়া আর কিছু পাইনি।

—কোথাও কাজের চাপে আটকে আছে নিশ্চয়।

—তুমি মাঝে মাঝে ও-বাড়ীতে খবর নিয়ো। চিঠি পেলে কলেজে এনে দেবে আমায়।

—দেব।—অসীম চলে গেল।

চায়ের দাম মিটিয়ে, ভারি মনে বাসে উঠলুম। একটা অনিশ্চয় আশঙ্কায় মন দুলছে। তোমার বাড়ী থেকে চলে এসেছি, তোমাকে না জানিয়ে এত দূরের স্কুলে চাকরি নিয়েছি, তুমি কী ভাবছ জানিনা। সব কথা খুলেই তো লিখেছিলুম তোমাকে। হয়তো রাগ করেছ, সেই জন্তেই চিঠি আসছে না তোমার।

বাবার চিঠি পেলুম। সেই একটি কথা : 'যেখানে যে-ভাবে থাকো, তুমি সুখী হইলেই আমার সুখ।' এতটুকুর ভেতরে কত যে অভিমান—কত ক্ষমা! কিন্তু তুমি কি আমাকে ভুলে গেলে? এতই কি কাজ যে একটা পোস্টকার্ডে দু-ছত্র লেখবারও তোমার সময় হয়না? ঘর বাঁধতে চাইনি, তোমার দুঃখের পথে সঙ্গিনী হতে চেয়েছিলুম, ভেবেছিলুম তোমার ভালোবাসা আগুন হয়ে জ্বলবে আমার জীবনে, সেই দাহই হবে আমার জীবনের পাথেয়। কিন্তু যেমন করে জ্বলে উঠতে চেয়েছিলুম : পারলুম না তো! তুমিই যে আমায় পরিত্যাগ করছ, সরিয়ে দিচ্ছ তোমার কাজের জগৎ থেকে, আমি যেন এখন তোমার প্রয়োজনের ভার, আমাকে ভুলে থাকতে পারলেই তুমি বাঁচো। দারুণ অভিমানে আর দুর্ভাবনায় রাত্রে চোখের জলে আমার বালিশ ভিজে যেতে লাগল।

হস্টেলটা যেখানে, সে-জায়গাটি সুন্দর। তার তিনদিকে দূর-দূরান্ত ছড়ানো ধানের ক্ষেত। তাকালে নীল-সবুজে সোনালিতে চোখ ডুবে যয়ে—ঠাণ্ডা হু-হু করে হাওয়া আসে রাতদিন, ঘরের ভেতর আমার জামাকাপড়-বইপত্র নিয়ে লুটোপুটি খায়। তোমাদের সেই বাড়ীটাকে স্বপ্নের মতো অবাস্তব লাগে এখানে। তবু এত আকাশ, এত ধান, এত সবুজ, এত বাতাস, এত আলো—সব আমার কাছে শূন্য হয়ে যেতে থাকে। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল, কোনো খবর নেই তোমার। যন্ত্রণায় মন ছটফট করে, কলেজে গিয়ে অসীমকে বিরক্ত করি। সমবেদনায় ভরা দু-চোখ মেলে অসীম চেয়ে থাকে আমার দিকে। বলে, আমরাও তো কোনো খবর পাচ্ছিনা। অফিসেও কোনো চিঠি নেই।

সেদিন রবিবার। মাস শেষ হয়ে আসছে, হস্টেলের কতগুলো

হিসেব-পত্রের ঝঞ্ঝাট নিয়ে বিব্রত ছিলুম। বেয়ারা এসে খবর দিলে, বিশ্বজিৎ মল্লিক।

টেবিল ছেড়ে এমনভাবে লাফিয়ে উঠলুম, এমন করে কাগজ-পত্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে বেয়ারা আমাকে পাগল ভাবল কিনা জানিনা। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, কোথায় তিনি? শিগগির ডেকে আন্ এখানে।

তুমি এলে। রোগা হয়ে গেছ, সারা শরীরে আশ্চর্য করুণ ক্লান্তির ছাপ। ভুলে গেলুম, হস্টেলের অফিস, ভুলে গেলুম—সামনে দিয়ে মেয়েরা আসছে যাচ্ছে, বেয়ারা ঘুরঘুর করছে। চোখ দিয়ে আমার জল পড়তে লাগল।

সামনের চেয়ারটায় বসে কিছুক্ষণ তুমি এমন করে আমার দিকে চেয়ে রইলে যে মনে হলো, এই প্রথম তুমি দেখছ আমাকে।

চোখের জল মুছে বললুম, এতদিনে মনে পড়ল?

—উপায় ছিল না। সাউথে যেতে হয়েছিল, ত্রিবাঙ্কুরে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লুম। তারও চাইতে বেশী গেল মেণ্টাল স্ট্রেন। —তোমার মুখে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা এমন ভাবে ফুটে উঠল যে আমি চমকে উঠলুম। স্বগতোক্তির মতো তুমি বললে, জানো, একবার ইচ্ছে হয়েছিল আমি সুইসাইড করি। এ যন্ত্রণা আর সইতে পারছিনা।

কান্না ভুলে গিয়ে আমি আর্তনাদ করলুম: সে কি!

—সে অনেক কথা। সব বলবার সময় নেই। অনেকদিন ধরেই কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারে কিছু মতভেদ ছিল, এখন সেটা চরমে উঠেছে। ওদের নতুন চিন্তাকে মেনে নিতে হলে আমাদের এতদিনের বনিয়াদ পর্যন্ত ধ্বসে পড়ে। অথচ—! কী যে যন্ত্রণা পাচ্ছি কৃষ্ণা, তোমাকে বোঝাতে পারব না। এখন নিজের কাছেই আমার হারের পালা শুরু হয়েছে '

—সেকি কথা! তুমি হেরে যাবে! জীবনে তো কখনো কারো কাছে হার মানো নি।

—সেই আত্মবিশ্বাসটাই ছিল। কিন্তু বিশ্বাসটা বেশি ছিল বলেই ভাঙনের ঘা এত নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিয়েছে। একটু চুপ করে থেকে বললে, তুমি ওখান থেকে চলে এসেছ, ভালোই হয়েছে। নইলে আমাকে ভাবনায় পড়তে হত। আমি কাল কলকাতায় এসেছি, আজই আবার চলে যাব।

—কোথায় যাবে?

—প্রথমে বোম্বে। তারপর আরো নানা জায়গায়। মাথার মধ্যে ঝড় বইছে আমার। একটা কিছু স্থির না হওয়া পর্যন্ত আমি যেতে পারছি না, ঘুমুতে পারছি না, এমন কি দুদণ্ড বসতে পারছিনা কোথাও। তোমাকে শুধু বলতে এসেছি—যা করেছ, বেশ করেছ!

আকুল হয়ে বললুম, সে সব পরে বোঝা যাবে। কিন্তু তুমি কবে ফিরবে?

—জানি না।—তুমি উঠে দাঁড়ালে: বললে, আমি চললুম।

আমি তোমার হাত চেপে ধরলুম: না, সব না বলে যেতে পারবে না আমি কি তোমার কেউ নই?

—তুমি আমার সব। কিন্তু বলবার সময় এখনো তার আসেনি। ফিরে এসে সব জানাবো, ততদিনে লক্ষ্য আমার স্থির হয়ে যাবে। আজ আমি চলি, রাত্রে বেরুতে হবে—অনেক জরুরি আলোচনা আছে ওদের সঙ্গে।

—কিছু খেয়ে নাও অন্তত। নইলে কোন মতেই ছাড়ব না।

—ছাট ইটার্নাল ইমোশন্যাল্ উয়োম্যান! কিছুতেই তোমাকে শেখাতে পারলুম না।—সেই আগের মতো করে তীক্ষ্ণ হাসিটিতে জ্বলে

উঠতে গিয়ে আবার নিবে গেল : কে জানে, এতদিন ভুল শিখিয়েছি কিনা!

সে-কথায় কান না দিয়ে বললুম, এখুনি আমি খাবার নিয়ে আসছি। তুমি পালিয়ো না।

—তোমার কাছ থেকে পালাবার জায়গা আমার কোথাও নেই। যদি পরলোক মানতুম, তাহলে বলতুম সেখানেও নয়।

॥ সাত ॥

দুটি মাস তুমি ঘুরে বেড়ালে উল্কার মতো। আমি কখনো কখনো এক আধ লাইন খবর পাই, কখনো পাই না। একবার নাকি কলকাতায়ও এসেছিলে একদিনের জন্যে, অসীমের কাছ থেকে জানলুম। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করলে না। দুঃখ পেলুম, কিন্তু রাগ করতে পারলুম না। মনকে বললুম, আমাকে গ্রহণ করেছ বলেই তোমায় আত্মসাৎ করে নেব—এত বড়ো শক্তি কি আমার আছে? তুমি সারা দেশের, সারা মানুষের। আমি যা পেয়েছি তা-ই আমার যথেষ্ট, এর বেশি অন্যায় দাবি কোনোদিন করতে চাইব না।

একটা অস্বস্তি কিছুতে ভুলতে পারছিনা। রমাপতি কাকার সেই শর্ত! পলিটিক্স করতে পারব না! অবস্থাচক্রে মেনে নিয়েছি, কিন্তু—কিন্তু কতদিন এভাবে লুপ্ত হয়ে থাকব! তোমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ভেবেছিলুম মুক্তি মিলেছে, কিন্তু এ যে দেখছি আরো ভয়ঙ্কর বন্ধন! এ থেকে কবে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তুমি! এ নির্বাসন আর কতকাল আমি সইব! এমনিভাবে নিষ্ক্রিয় থেকে থেকে আমি যে তোমারই ব্রত থেকে সরে যাচ্ছি দিনের পর দিন! এ ক্ষতি আমার পূরণ হবে কেমন করে! শেষকালে অসীমকে বললুম, ভাই বাঁচাও।

—কী হল আবার?

—ইস্কুলের চাকরি বাঁচিয়ে করতে পারি, এমন কিছু কাজ দাও আমায়। একেবারে অকর্মা হয়ে যাচ্ছি যে।

একটু চুপ করে রইল অসীম। তারপর বললে, এখন থাক বৌদি।

—কেন?

—কিছু বুঝতে পারছিনা, আমাদের একটা আন্‌সার্টেন অবস্থা যাচ্ছে।

—ব্যাপার কী বলো তো।

অসীম একটু আশ্চর্য হল: কেন, বিশ্বজিৎদা কিছু বলেনি তোমাকে?

—কখন বলবে? এই দেড় দু-মাসের ভেতরে মাত্র তো তিন মিনিটের জন্যে দেখা হয়েছিল একবার।

অসীম বললে, তোমার যদি সময় থাকে, একটা নিরিবিলি জায়গায় চলো কোথাও। সব বলছি।

একটা রেস্তোঁরার কেবিনে গিয়ে বসলুম। অসীম চা খেতে খেতে নীচু গলায় অনেকগুলো আলোচনা করে গেল। তোমাদের চিন্তার কিংবা তত্ত্বের সব কথা এর আগেও আমি সব যে স্পষ্ট করে বুঝেছি তা নয়, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করেছি, কতগুলো উজ্জ্বল সত্যের প্রকাশ শুনেছি তোমার মুখে—আর তা-ই মেনে চলেছি। আজ এসব জটিল তত্ত্ব শুনতে শুনতে মাথা ঘুরে গেল।

অসীম বললে, কিন্তু এটা বুঝতে পারছ তো?

ঠিক বুঝিনি। কিন্তু এটা বুঝতে বাকী রইল না যে ঝড় আসছে।

আরো মাস খানেক যন্ত্রণা আর অনিশ্চয়তার পালা। তোমার চিঠি বন্ধ। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যের দিকে ছুটতে ছুটতে এল অসীম। শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছিল, কলেজে যাইনি।

ঘরের আলো নিবিয়ে শুয়েছিলুম আর মাথার ভেতরে নানা চিন্তা পাক খাচ্ছিল। বাইরে থেকে এ-সময় হস্টেলে কারো দেখা করবার নিয়ম নেই। কিন্তু এমার্জেন্সী হলে আলাদা।

অসীম বললে, এখনি যেতে পারবে কৃষ্ণাদি? জরুরি ব্যাপার।

—কী হয়েছে?

—বিশ্বজিৎদার অসুখ।

আমি চাপা গলায় চীৎকার করলুম একটা। পৃথিবী ঘুরে উঠল যেন চারদিকে।

অসীম বললে, ভয়ের কিছু নেই। নার্ভাস ব্রেক-ডাউন।

— নার্ভাস ব্রেক-ডাউন!

অসীম শুকনো গলায় বললে, অতিরিক্ত পরিশ্রম আর মেণ্টাল অ্যাংজাইটি হলে যা হয়। তুমি আসতে পারবে একবার?

—দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

ছুটে গেলুম সেক্রেটারির বাড়ীতে। স্বামীর অসুখের খবর জানিয়ে আপাতত ছুটি নিলুম তিন দিনের। তারপর যে-কাপড়ে যে-ভাবে ছিলুম, বেরিয়ে এলুম অসীমের সঙ্গে।

বাসে আসতে আসতে সব শুনলুম অসীমের কাছ থেকে। পরশু সকালে অদ্ভুত চেহারা নিয়ে ওদের বাড়ীতে তুমি হাজির। চুল উস্‌কো-খুস্‌কো—চোখ টকটকে লাল, সমানে চিৎকার করে চলেছ —"This is the way the world ends, this is the way the world ends, this is the way—"

ওদের বাড়ীশুদ্ধ সবাই ছুটে এল। কী ব্যাপার?

তুমি আবার শুরু করলে, Standing on the quicksand of life, when I dream of the stars—

অসীম এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখল, দারুণ জ্বর।

তাড়াতাড়ি এনে শুইয়ে দিলে। অসীম বললে, বাড়ীতে খবর দিই ?

—No—no। আমার কোনো বাড়ী-ঘর নেই, আমার কেউ নেই।

—কৃষ্ণা বৌদিকে ডেকে আনি ?

—Who is she ? Oh, that foolish girl ! Alas—I have ruined her !

—ডেকে আনব তাকে ?

—না—না, কাউকে ডেকে আনতে হবে না। আমি একা থাকতে চাই, all alone !

ডাক্তার এলেন। বললেন, ভাববার কিছু নেই। নার্ভাস ব্রেক ডাউন। রেস্ট দরকার, ভালো নার্সিং চাই।

আজ সকাল থেকে খানিকটা স্বাভাবিক। চোখের লাল রঙ একটু ফিকে হয়ে এসেছে, কথাবার্তায় একটু প্রকৃতিস্থ। তাই ভরসা করে অসীম এসেছে। আগে আমাকে নিয়ে গেলে হয়তো অন্য কোনো রকম রি-অ্যাক্‌শ্যন হত, হয়তো আমি দুঃখ পেতুম—একটু সংকুচিত হয়ে অসীম বললে, তুমি রাগ করোনি তো ?

—না ভাই, রাগ করব কেন ? তোমরা ওকে কত ভালবাসো —বলতে বলতে কান্নায় আমার গলা বুজে গেল, আমি কথাটা শেষ করতে পারলুম না। কী ভাবে ওদের বাসায় এসে পৌঁছুলুম শুধু আমিই জানি।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাধারণ ভাড়াটে বাসা। জায়গার টানাটানি। তবু অসীমের মা-বাপ দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত, তোমাদের মত সমর্থন করেন, তোমাকে ভালোবাসেন, তাই সব অসুবিধে মেনে নিয়েও একটি ঘর তোমার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন, ডাক্তার আনিয়েছেন,

খরচপত্র করছেন। অসীমের মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কিছু ভেবোনা মা, বিশ্বজিৎ তো আমাদেরও ছেলে!

এত স্নেহ, এত মমতা। দুঃখ, অভাব, গ্লানি—সব আছে, তবু বাংলা দেশের মাটির মতোই তার মানুষের বুক স্নেহে করুণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে, এই কথাটা যখনই ভাবি তখনই আমার দেশের মানুষের ওপর কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না আমার। তুমি পুনর্জন্ম স্বীকার করো না। কিন্তু এই দুঃখে ভরা ভাঙা বাংলা দেশে বার বার ফিরে আসবার জন্যে আমি পুনর্জন্ম মানতে রাজী আছি।

তখন অবশ্য এসব-ভাববার সময় ছিল না। আমি ছুটে গেলুম তোমার কাছে।

অচেনা অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলে আমার দিকে। তারপর বিড়বিড় করে বললে, কৃষ্ণা!

কান্নায় ভেঙে পড়ে আমি বললুম, আমাকে কেন খবর দিলে না তুমি?

তুমি বললে: "হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয়, দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

—আমি তোমার কেউ নই?

—কেউ আমার নয়। বন্ধুগণ, আমি চললুম। Now, I hate everything, I hate myself! এবার আমাকে খুঁজে দেখতে হবে পথ কোথায় আছে। যদি কোথাও সে পথের সন্ধান না পাই—then, then—না কৃষ্ণা, তুমি চলে যাও এখান থেকে। এক্ষুনি। I am a lost case,—আমাকে আর ফিরে ডেকো না।

তিন দিনের জায়গায় দশদিন ছুটি নিতে হল। ব্যাগের শেষ

পয়সাটি খরচ করলুম, মীরার কাছ থেকে টাকা ধার করলুম, তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য আনলুম! তারপর মনে পড়ল, তোমার তো পাওনা টাকা আছে বাড়ীতে।

গেলুম সেখানে। কী অভ্যর্থনা পেলুম, সে আর মনে আনতে চাই না। টাকা তাঁরা দিলেন না। বললেন, বিশ্বজিৎ তার তু'মাসের টাকা আগাম নিয়ে গেছে। বিশ্বাস হলনা, কিন্তু সত্য-মিথ্যা যাচাই করব কার কাছে?

শুধু একটি জিনিস সঞ্চয় করে আনলুম ওখান থেকে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তু-কান ভরে বাজতে লাগল দূর থেকে ছুড়ে দেওয়া একটা কথা: পাগল হবে না? হবেই তো। মল্লিক বাড়ীর ছেলে, হুট করে কাকে বিয়ে করে আনল—বিষ খাইয়ে যে পাগল করে দেয়নি, কে বলবে?

এর বেশি কিছু আশা করিনি ওদের কাজ থেকে। তবু—!

তার পরের অধ্যায়টা যেন স্বপ্ন।

তুমি তো অনেকটা ভালো হয়ে উঠলে, কিন্তু অসীমদের বাসায় তো অনিশ্চিত কালের জন্যে তোমায় ফেলে রাখা যায় না। ওঁদের স্নেহের ওপর আর কতখানি সুযোগ নেওয়া চলে? অথচ অন্তত আরো তু-মাস তোমার রেস্ট দরকার।

ওঁরা বললেন, থাক না বিশ্বজিৎ এখানেই, ও তো আমাদেরই ছেলে।

কিন্তু মনে মনে জানি সে হয় না। জিনিসটা অত্যাচারের রূপ নিচ্ছে ক্রমশ। ব্যবস্থা একটা করতেই হয়। ছুটে গেলুম রমাপতি কাকার কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন স্বগতোক্তির মতো বললেন, আমাদের কাউকে জিজ্ঞেস না করে হঠাৎ একটা বিয়ে

করে বসলে, এখন–। কিন্তু বলতে বলতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

—দেখি, কী করা যায়।

যেখানে আমাদের স্কুল, সেই গ্রামেই ছোট একটা বাসার ব্যবস্থা করে দিলেন। দুখানি ঘর, রান্নাঘর, কুয়োতলা, দুটো পেঁপে গাছ। ভাড়া দিতে হবে না—ওঁদের নিজেদেরই বাড়ী। যখন জমিদারী ছিল ওঁদের কর্মচারীরা থাকতেন ওখানে।

আমি তোমায় নিয়ে এলুম। বিয়ের পরে আমার প্রথম সংসার।

হস্টেলে আর থাকা চলল না, কিন্তু অ্যালাউন্সটা কাটলেন না। বিকেলে ঘণ্টা তিনেক গিয়ে অফিসে বসতে হয়, সব দেখতে হয়, মেয়েদের খবরাখবর নিতে হয়। অর্থাৎ ওদের দিক থেকে যতটা সম্ভব অনুগ্রহ বৃষ্টির ত্রুটি রইল না। অসীম আসা যাওয়া করে, তোমার একটা চিঠি নিয়ে ও বাড়ী থেকে মাসের টাকাটা আদায় করে আনে —কাশীতে মাকে চল্লিশটা করে টাকা পাঠায়। আমি পাই সব মিলিয়ে শ'খানেক টাকা। আমার সংসার!

তবু কী আনন্দ—কী আনন্দ! বিয়ের পরে এতদিনে তোমায় প্রথম পেলুম আমি। অনেক লোকের ভিড়ের ভেতর থেকে তুমি আমার হয়ে এলে। জানি, তুমি আমাকে স্বার্থপর বলবে; সকলের মানুষ তুমি—তোমাকে একা দখল করে নেওয়ার মধ্যে ঔদার্য নেই, ব্রত পালনের সত্যও নেই। সব আমি মানি। কিন্তু আমার মনে হল, যে রাজার রাজা—সে যদি দু'দিনের জন্যেও আমার কুটিরে এসে থাকে, আমি সুযোগ কেন ছাড়ব! আমার যা আছে, সব দিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য সাজিয়ে দেব তোমাকে।

শুধু একটা কথা বলতে পারলুম না। জোর করে চলে এসেছিলুম

বাবার কাছ থেকে, বিদ্রোহ করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো তাঁরই কাছে আমায় হার মানতে হল। সেই মাথা নামাতে হল বাবার বন্ধু রমাপতি কাকার কাছেই—যাকে পয়লা নম্বরের শত্রু বলে মনে হয়েছিল আমার, অথচ দুর্দিনের সমুদ্রে তিনিই তো আমায় ভেলা জুটিয়ে দিলেন!

জানি, সে অপমান তোমাকে বিঁধেছিল। সব চেয়ে বেশি করে বিঁধেছিল চাকরির শর্তটা—কেননা পলিটিক্সের মধ্যে আমি থাকতে পারব না। তুমি ভালো হয়ে উঠলে, কিন্তু তোমার মুখের হাসি আর ফিরে এল না। একটা ইজিচেয়ারে চুপ করে বসে থাকো, বিড়ির পর বিড়ি টেনে চলো, আর কুয়োতলার পেঁপে গাছ দুটোর দিকে চোখ মেলে দিয়ে সমস্ত মনটাকে অনেক দূরে ভাসিয়ে দাও।

কলেজে পড়বার জন্যে চাকরি নিয়েছিলুম, কিন্তু কলেজ ছাড়তেই হল। সকালে স্কুল, দুপুরে কলেজ, সন্ধ্যায় হস্টেল, তোমাকে দেখব কখন? পরীক্ষা পরে না হয় প্রাইভেটেই দেব, কিন্তু তোমাকে না দেখলে কেমন করে চলবে?

কিন্তু তোমার মনে তিল তিল করে যন্ত্রণা জমছিল। এ যেন নেপোলিয়নের মতো কোন সম্রাটের নির্জন-নির্বাসন, শক্তির আবেগ বুকের ভেতর মাথা খুঁড়ে আছড়ে মরছে, বেরুবার কোথাও কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না! সব বুঝতে পারছি—অথচ কি আমার করবার আছে!

একটু একটু করে তুমি খিটখিটে আর খুঁৎখুঁতে হয়ে উঠতে লাগলে।

আগে কখনো তোমায় অধৈর্য হতে দেখিনি, চূড়ান্ত উত্তেজনার সময়ও দেখেছি ওস্তাদ মাঝি যেমন ভাবে হাল ধরে ঝড়ের নৌকো

সামাল্ দেয়, তেমনি করে সব তুমি পার হয়ে গেছ। অসীম, নীরদ —এরা সবাই জামার আস্তিন গোটাতে চেয়েছে, তুমি বলেছ, কেন মাথা গরম করছিস, যে টেম্পার লুজ করে নিজের কেসও লুজ করে সে। বী পেসেন্ট!

অথচ, কেমন করে তুমি যে বদলে গেলে!

জানি সবই অসুখের ফল, তোমার স্নায়ুগুলোকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে। রক্তে জোর না থাকলে একটা ছোট ফুস্কুড়িও বিষিয়ে ওঠে। আমি তো যা পারি প্রাণপণেই করি, তবু মাঝে মাঝেই শুনতে হয়, একেবারে হোপলেস্—একটা কাজই কি করতে পারো না?

মাঝে মাঝে আমারও খারাপ লাগে বই কি! সারা দিন আমাকেও তো খাটতে হয়, আমারও তো কখনো কখনো ক্লান্তি আর অবসাদে সারা শরীর আচ্ছন্ন হয়ে আসে। তবু তখনই আমি অনুতপ্ত হই। অসীমের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, কি নিদারুণ আঘাতে তোমাকে এতদিনের পথ থেকে আজ সরে আসতে হচ্ছে। এখন একটা শূন্যের ভেতর তুমি পাখা ঝাপটে মরছ, না পাচ্ছ লক্ষ্য, না মিলছে সান্ত্বনা।

আমি হাসতে চেষ্টা করি: দাঁড়াও, দাঁড়াও—সব শিখে নেব।

তুমি জবাব দাও না। ভ্রূকুটি মেলে চেয়ে থাকো আকাশের দিকে।

মাঝে মাঝে বলো: এ আমার আর সহ্য হয় না—আমি ফসিল হয়ে যাচ্ছি।

সান্ত্বনা দিয়ে বলি, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কাজের সময় তো পড়েই আছে সারাটা জীবন। শরীরটা আগে সারুক, তারপর দেখা যাবে।

—শরীর আমার সেরে গেছে। আমি চলে যাব এখান থেকে।

যাও দেখি আমার হাত ছাড়িয়ে? মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হবো তা হলে।

–সেই মেয়েলি টেক্‌নিক?—পুরোনো হাসির ভঙ্গিতে তোমার ঠোঁটের কোণা বেঁকে ওঠে।

—আমি তো মেয়েই। পুরুষ হওয়ার অভিমান আমার নেই। হতেও চাই না।

আবার একদিন। সেদিন দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলে।

—আমাকে পালাতে হবে। পালাতেই হবে এখান থেকে।

—কেন, কি হল আবার?

হাতের খবরের কাগজটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, দেখছনা, আমি বাতিল হয়ে গেছি? ওরা কেউ আর আমাকে চায় না—ওদের কাছে আমার আর কোনো ভূমিকা নেই। ছাখো না, কেউ আসে না আমার কাছে? শুধু অসীমটা পার্সোনাল অ্যাটাচমেণ্টে আসে, নইলে আড়ালে আড়ালে ও-ও আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।

তীব্র প্রতিবাদ করে আমি বললুম, অসম্ভব। অসীম সম্পর্কে একথা তুমি কিছুতেই বলতে পারো না।

—চুপ করো কৃষ্ণা।—বেয়াড়া গলায় তুমি আমাকে এমন একটা ধমক দিলে যে আমি কেঁপে উঠলুম। তুমি বললে, নিজের লিমিটের মধ্যেই থাকো কৃষ্ণা। তোমাদের মেয়েদের এই দোষ সব জিনিসে অনধিকার-চর্চা করতে চাও। যা বোঝোনা, কেন তর্ক করতে যাও তা নিয়ে?

আহত অভিমানে আমি তোমার সামনে থেকে সরে এলুম। ক'দিন ধরে এই একটা নতুন কথা শুনছি তোমার মুখ থেকে। মেয়েরা যে পুরুষের চাইতে বুদ্ধি বিবেচনায় অনেক নীচে, তারা যে

পুরুষের মনের সঙ্গে পা ফেলে চলবার যোগ্য নয়—এমন থিয়োরী এর আগে কোনোদিন তোমার ছিল না। বরং উল্টো কথাই বলে এসেছ বরাবর। আমাকে যখন ভালোবেসেছিলে সেদিনের একটি কথা আমার মনের ভেতর থেকে থেকে গুনগুন করে উঠতে লাগল : 'আমাকে ভালোবেসো, কিন্তু শ্রদ্ধা কোরো না কোনোদিন। ভালোবাসার ভেতর ইক্যুয়ালিটি আছে। কিন্তু শ্রদ্ধাটা এক তরফা দাসত্ব। আমাদের মেয়েদের সব চাইতে বড়ো মৃত্যুবাণ ওখানেই।'

আমি তর্ক তুলেছিলুম। তার উত্তরে তুমি বলেছিলে, 'আজ ইতিহাসের নিয়মে পুরুষেরই শ্রদ্ধা করা উচিত মেয়েদের। তাকিয়ে ছাখো চারদিকে।' কিন্তু সেদিন আর নেই। তোমার চিন্তা এখন অন্যদিকে চলেছে।

স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, দারুণ চিৎকার করছ তুমি। অসীম বসে আছে বিষণ্ণ মুখে। তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হল, পালাবার রাস্তা খুঁজছে সে।

বললুম, একি কাণ্ড ! রাগারাগি করছ কেন ?

তুমি বললে, শাট্ আপ ! আমাদের হাতে তৈরি হল, এখন আমাকে থিয়োরী বোঝাতে এসেছে ! গেট আউট অসীম—গেট আউট ! আর কোনোদিন তোর মুখদর্শন করব না আমি।

সভয়ে বললুম, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? কাকে কী বলছ ?

—ঠিকই বলছি। তোমাদের মতো ইডিয়েটেরাই আমাকে পাগল করে দেবে।

তুমি আমায় গালাগাল দিলে ! এ অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখল অসীম। তারপর হাত জোড় করে বললে, আমার ঘাট হয়েছে বিশ্বজিৎদা, মাপ করো। আর

যদি আমাকে মাপ না করতে পারো, চটেই থাকো—কিন্তু দয়া করে বৌদিকে গালমন্দ কোরো না।

তুমি উঠে দাঁড়ালে ইজিচেয়ার ছেড়ে। গোঁ গোঁ করে চলে গেলে ঘরের ভেতর।

আমি অসীমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। চোখ দিয়ে আমার জল পড়তে লাগল।

বললুম, তোমাকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখি অসীম, তার চাইতে বেশি বলে মনে করি। তুমিও যদি ওঁর ওপরে রাগ করো, তা হলে আমার যে দাঁড়াবারও জায়গা থাকবে না।

অসীম হা হা করে হেসে উঠল: কি যা তা বলছ বৌদি—রাগ করব কেন? বিশ্বজিৎদার ধমক খেয়েই তো পলিটিকস্ শিখেছি। আমারই অন্যায় হয়েছে তর্কটা বাড়িয়ে দেওয়া। আমি অবশ্যি ওঁর সঙ্গে কোনো আলোচনা করি না, সব সময় এ্যাভয়েড করে যাই, কিন্তু ও-ই এমন করে জিনিসটা তুলল যে কিছু না বলে থাকা গেল না। সেজন্যে নাকে-কানে খৎ দিচ্ছি এখন, এ ভুল আর কোনোদিন করব না। কিন্তু তুমি আপাতত যাও দেখি, চট্‌পট্ এক পেয়ালা চা করে খাওয়াও।

॥ আট ॥

খোঁড়া পা-ই খালে পড়ে—চলতি কথা আছে একটা। তা না হলে ঠিক সময় বুঝেই এমনি বিশ্রী ব্যাপারটা এসে হাজির হল কেন?

কী গুণে জানি না, নতুন টীচার হয়েও সহকর্মী শিক্ষিকাদের ভালোবাসা আমি পেয়েছিলুম। অবস্থাচক্রে আমাকে স্কুলে চাকরি নিতে হয়েছিল, ভেবেছিলুম আদৌ ভালো লাগবে না, নিতান্তই প্রয়োজনের চাপে সাময়িক ভাবে আমাকে হার মানতে হয়েছে—কিন্তু দেখলুম, আমার খারাপ লাগল না। আমি মাস্টারের মেয়ে, দাদামশাই সেকালের দুর্দান্ত খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন। মাস্টারি আমার রক্তে রক্তে। কিছুকাল অস্বস্তিতে কাটিয়ে শেষে মনে হল, এ-ই আমার আসল জায়গা, মাস্টারি ছাড়া আর কিছু করবার যোগ্যতা নিয়েই আমি আসিনি।

সংসার না চালাতে পারলে, রাত-দিন টিউশন করতে হলে, অনেক-গুলো মুখের অন্ন জোগাবার দায় থাকলে, বয়েস বাড়বার ক্লান্তিতে সারা শরীর মন এলিয়ে পড়তে চাইলে—তখনই মাস্টারি খারাপ লাগে, নিজের ডাক্তারিকে রাত-দিন অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে। নইলে সাধারণ ভাবে যাদের মাস্টারির মেজাজ আছে, মোটামুটি দিন চালাবার উপায় আছে আর অল্প বয়সের উৎসাহে মন যাদের টগবগ করে, তাদের কাছে এ-কাজ চাকরির চাইতে আরো অনেক বেশি। নতুন চঞ্চল জীবনগুলো তাদের চারদিকে ঢেউ তোলে—ছোটখাটো দুঃখ সুখের দোলায় দুলিয়ে দেয়—প্রথম পাখি আর প্রথম গানের খবর তাদের কাছেই এসে পৌঁছোয় সকলের আগে। বিরক্তি যে

কখনো কখনো লাগে না তা নয়—ঢের বেশি ভালো-লাগা সে ক্ষতিটুকু পূরণ করে দেয়।

এত কথা এই জন্যে বলছি যে চাকরি সম্বন্ধে আমার অভিযোগ ছিল না—কেবল অভাবটুকু ছাড়া। তা-ও আমি ভুলে ছিলুম বিশ্বজিৎ, কারণ তুমি আমার ভাঙা ঘরে তখন মণি হয়ে জ্বলছ। তখন আমার খুদ-কুঁড়োও সোনার মুঠো। তোমার যন্ত্রণার অংশ আমি পেতুম, কিন্তু তোমার মতো বিরাট মানুষকেও আমি যে আজ বুকের ভেতরে আশ্রয় দিতে পেরেছি—এই আত্মপ্রসাদটুকুই আমায় আলো করে রাখত। তুমি জীবনে কারও সেবা চাওনি, অন্যের পরিচর্যা নেওয়াটাকে তুমি এক্সপ্লয়টেশ্যন মনে করো—কিন্তু তোমার মতো স্ব-নির্ভর শক্তিমানকেও সেবা করে কৃতার্থ হওয়ার মতো কেউ-কেউ ছিল। আমি তাদেরই একজন। বিশ্বজিৎ, আমার এই মেণ্টাল স্লেভারিকে তুমি ক্ষমা কোরো।

চাকরি এবং তোমাকে নিয়ে আমি সুখী ছিলুম, সব অভাব, আর তোমার যন্ত্রণার মধ্যেও আমি সুখী ছিলুম। কারণ আমাদের মতো সাধারণ মেয়েরা যে ঘর সংসার করবার স্বপ্ন কৈশোর থেকেই চেতন-অচেতন ভাবে মনের ভেতরে লালন করে, সেই সংসার আমার শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে ছোট্ট একটু কাঁটা বিঁধল, সহকর্মী শিক্ষিকাদের প্রীতির ফলে আমি স্কুল-কমিটিতে টীচার্স রিপ্রেজেণ্টেটিভ্ নির্বাচিত হলুম।

স্কুল নতুন, সমস্যা অল্প, আমার দায়িত্ব ছিল সামান্য, কমিটিতে বক্তব্য ছিল আরো কম। কিন্তু হঠাৎ একদিন এসে দেখা করলেন মণিভূষণ বাবু। কমিটির একজন অল্পবয়েসী সদস্য তিনি।

—আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে মিসেস মল্লিক।

—বেশ, বলুন।

মণিভূষণ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আপনার হিস্ট্রি আমি জানি।

আমি চমকে উঠলুম। কী ইতিহাস জানেন তিনি? কী বলতে চাইছেন? একটা অনিশ্চিত ভয় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার বুকের ওপরে। বিবর্ণ হয়ে আমি চেয়ে রইলুম তাঁর দিকে, কোনো জবাব দিতে পারলুম না।

মণিভূষণ বললেন, আপনার স্বামী বিশ্বজিৎ বাবু আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। তাঁর মীটিঙে আমি অনেকবার গেছি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি।—একটু চুপ করে থেকে বললেন, হয়তো বুঝতে পারছেন, আমি তাঁরই দলের লোক।

আমার হৃৎপিণ্ডে ঘা পড়তে লাগল। বললুম, কিন্তু তিনি তো—

—জানি। সবই শুনেছি। আমাদের অবস্থাও তো ওই—এখন ন যযৌ, ন তস্থৌ। কিন্তু সে সব আলোচনা থাক। মোট কথা—আমাকে নিজের লোক বলে মনে করতে পারেন।

বললুম, সে তো নিশ্চয়ই।—এ ছাড়া আর কী যে বলা যায় ভেবে পেলুম না।

কিছুক্ষণ সহানুভূতিভরা চোখে মণিভূষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, দেখুন—আপনি যে বিশ্বজিৎ মল্লিকের স্ত্রী এ আমি কল্পনাই করতে পারিনি। পরে যখন জানতে পারলুম, তখন মনে হল: ছিঃ—ছিঃ, কী অন্যায়। কোথায় সসম্মানে নিয়ে এসে আপনার হাতে স্কুলের সব চার্জ তুলে দেব, তার বদলে—। —একবার থামলেন মণিভূষণ: কী ইন্‌সাল্‌টিং কণ্ডিশ্যনে আপনাকে চাকরি নিতে হয়েছে সে-ও আমি শুনেছি। এদের টেকনিকই এই—বুঝলেন না?—তিক্ত জ্বলতে লাগল মণিভূষণের দৃষ্টিতে: চিরকাল এরা এই ভাবেই মানুষের হেল্‌পলেস্‌নেসের ওপরে অ্যাড্‌ভান্‌টেজ্ নেয়। ডিজগ্রেসফুল!

কথাগুলো ভালোই, আমার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি না, আমার অস্বস্তিবোধ হল। এটুকু দুর্বলতা ক্ষমা কোরো বিশ্বজিৎ, আমি এ-কথা না ভেবেই পারলুম না যে যখন একটা আলাদা জীবনকে আমি নীড়ের মতো গড়ে তুলছি, তখন এ-সব প্রসঙ্গ আর ফিরিয়ে আনবার দরকার ছিলনা। মানি আমার আকাশ ছিল, ঝড়েই আমি ডানা মেলতে চেয়েছিলুম, তবু ছোট্ট একটুখানি বাসার মোহ ধীরে ধীরে আমায় ঘিরে ধরছিল আজকে।

কাজেই আমি চুপ করে রইলুম।

মণিভূষণ বললেন, বিশ্বজিৎ বাবুর সঙ্গে আলাপ করতুম, কিন্তু—

আমি ত্রস্ত হয়ে বললুম, না—না। ওঁর শরীর এখন আদৌ ভালো নেই, অল্পেই নার্ভগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—জানি। সেজন্যে আমি আসিনি। উনি আমাদের একজন নেতা, সময়-সুযোগ মতো পরে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আপাতত আমি স্কুলের ব্যাপারে আপনার সঙ্গেই আলাপ করতে চাই।

—স্কুলের ব্যাপারে ?—আমার মনে ছায়া নামল। রমাপতি কাকা বলেছিলেন, আমাকে পলিটিক্সের সম্পর্ক ছাড়তে হবে। শর্তটায় অপমান নিশ্চয় ছিল, কিন্তু আমি তো তাঁকে কথা দিয়েছিলুম।

মণিভূষণ বললেন, হ্যাঁ, স্কুল সম্পর্কেই। সেক্রেটারী উমাপতি বাবুর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

উমাপতি বাবু রমাপতি কাকার জেঠতুতো ভাই। স্কুলের শুধু সেক্রেটারী নন—অন্যতম ফাউণ্ডারও বটেন। আমার অস্বস্তিটা বেড়ে উঠল। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তাঁর কিছু কিছু স্নেহ আমি পাই, ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, আমাকে বাড়তি কতকগুলো সুবিধে দেওয়ার ব্যাপারে ওঁর অনেকটাই হাত ছিল।

শুকনো হয়ে আমি বললুম, বলুন।

মণিভূষণ বললেন, আপনি টীচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ্। সবাই আপনাকে বিশ্বাস করে, আপনার ওপরে আশা রাখে। আপনিই বলুন, যে পে-স্কেল্ আপনাদের দেওয়া হয়, সেটা কি আইন-সম্মত?

আমি বললুম, না। কিন্তু নতুন স্কুল, ইনকাম—

উত্তেজিত হয়ে মণিভূষণ বললেন, ছ্যাট্‌স্ নট আওয়ার লুক-আউট। স্কুল যখন করা হয়েছে, তখন অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল্‌স মাইনে দিতেই হবে, স্কুলের ফাণ্ড না থাকে—জোগাড় করে দিতে হবে। এ নিয়ে নেক্‌স্‌ট্ কমিটি মীটিঙে আপনি ভয়েস তুলবেন।

আমি চমকে উঠে চুপ করে রইলুম।

—ইউ আর নট্ অ্যালোন।—মণিভূষণ বলে চললেন, আমি সাপোর্ট করব আপনাকে। আরো দু-একজন মেম্বারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। দে আর অল্‌সো উইথ আস।

আমি চুপ করে রইলুম।

—তা ছাড়া প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ড্। এখন পর্যন্ত তারও কোনো ব্যবস্থা হল না। স্কুল টীচাররা নিশ্চয় দিন-মজুর নয়—তাদের সম্পর্কে স্কুল কমিটির একটা মিনিমাম রেসপন্‌সিবিলিটি আছে। কী বলেন আপনি?

সামনের টেবিলটার ওপরে হাতের ভর রেখে আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইলেন মণিভূষণ—তাঁর দৃষ্টি আমি সইতে পারছিলুম না। মনে হতে লাগল যেন হাত-পা বেঁধে আমাকে আগুনের ভেতরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। জীবনে বুঝি এমন বিব্রত আর বিপন্ন কোনোদিন বোধ করিনি, এমনকি তোমার সেই সাংঘাতিক অসুখের সময়ও নয়।

মণিভূষণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী বলেন আপনি?

কী বলব? রমাপতি কাকাকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দু'হাত বাড়িয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল, কে যেন আমার জিভটাকে টেনে নিতে চাইছিল ভেতর দিকে। তবু একটু সামলে নিলুম আমি।

বললুম, আমি যতদূর জানি, অন্য টিচাররা এ নিয়ে গ্রাম্‌বল্‌ করেন না।

—কী করে গ্রাম্‌বল্‌ করবে?—মোটা কাচের চশমার আড়ালে ধ্বক ধ্বক করতে লাগল মণিভূষণের চোখ: দিনকাল দেখছেন না? একটা চাকরি জুটলেই বর্তে যায় সবাই। বাট্‌ জাস্টিস্‌ মাস্ট্‌ বি ডান্‌। তাঁরা ভীরু বলেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

বললুম, তা ছাড়া শুনছি, ওঁরা হয়তো আসছে বছর পি-এফ্‌ ইণ্ট্রোডিউস্‌ করবেন। রেট্রোস্‌পেক্‌টিভ্‌ এফেক্টে।

—আসছে—বছর?—ব্যঙ্গের হাসি হেসে মণিভূষণ বললেন, সে-কথা গত বছরও ওঁরা বলেছিলেন। আসল কথা কি জানেন, এই উমাপতিবাবু অ্যাণ্ড্‌ কোং—যারা সেদিনও জমিদার ছিল, তারা ব্যাকবোন পর্যন্ত বুর্জোয়া। ন্যাচারালি অ্যান্টি-পুয়োর, মানুষকে শোষণ করতে না পারলে এদের পেটের ভাতই হজম হয় না। আসছে বছর? আশায় আশায় বসে থাকুন, সামনের বছরে আবার পরের বছরের প্রতিশ্রুতি পাবেন। ও ভাবে হবে না। ইউ মাস্ট্‌ ফোর্স দেম্‌ টু ডু ইট্‌—এ ছাড়া আর কোনো রাস্তাই নেই।

—কিন্তু—

—কিন্তু কিসের মিসেস্‌ মল্লিক? এগিয়ে আসুন আপনি, রেইজ ইয়োর ভয়েস,আমরা পেছনে আছি।

আমি ক্ষীণস্বরে বললুম, কিন্তু আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন। আমি নতুন টিচার। কোয়ালিফিকেশন কিছু নেই। গ্র্যাজুয়েট

নই, বি-টি নই, এমনকি জুনিয়ার ট্রেন্‌ড্‌ পর্যন্ত নই। এ অবস্থায় ওঁরা যদি বলেন—

—কী বলবেন ওঁরা?—উগ্র হয়ে মণিভূষণ বললেন, কিছু বললে আমরা আছি। জানেন, জিনিসটা আমরাই কমিটিতে তুলতুম, কিন্তু টীচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌ যদি নিজেদের দাবি না জানান, তা হলে উমাপতি অ্যাণ্ড্‌ কোং বলবে—টীচাররা যখন সুখে আছেন, তখন আপনারা কেন মাথা ঘামাচ্ছেন এ নিয়ে? তাই আপনাকে সামনের মীটিঙে এইসব আলোচনাগুলো তুলতে হবে।

—দেখুন, আমি নতুন টীচার—

এবার মণিভূষণের চোখে আগুন নয়, অন্য একটা কিসের ছায়া পড়ল। যেন বুঝে নিতে চাইলেন, আমি কি সত্যিই সেই বিশ্বজিৎ মল্লিকের স্ত্রী—যে কখনো কোনো অন্যায়ের সঙ্গে চুক্তি করে না? কোনো মিথ্যা—তা সে যতই শক্তিধর হোক—তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে এক বিন্দু সংকোচ করে না? মণিভূষণ বোধ হয় ভেবেছিলেন, আমিও তার মতো ইস্পাত দিয়েই তৈরী, লোভ-তুচ্ছতা-ভীরুতা মেয়েলিপনার একটা কাদার তাল মাত্র নই। কিন্তু আমার শঙ্কা আর সংকোচ যেন চকিতের জন্যে তাঁকে বিভ্রান্ত করে দিলে।

মণিভূষণ এবার শান্ত হলেন। বললেন, কিসের ভয় পাচ্ছেন আপনি? চাকরীর?

আমি লক্ষ্য করলুম, তাঁর ঠোঁটের কোণা একটু বাঁক নিয়েছে। অন্য সময় হলে এ হাসি আমি সইতুম না, এমনকি তোমার মুখেও নয়। কিন্তু আজ সব আলাদা' আমাকে অনেক বেশি সহনশীল হতে হয়েছে, অনেক বেশি বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়েছে। লজ্জায় অপমানে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলেও আমাকে বলতে হল: যদি বলি, তাই?

মণিভূষণ চুপ করে রইলেন। দেখলুম, ওঁর মুখের পেশীতে নানা

রকমের ঢেউ খেলছে। যেন মনের ভেতরে একটা মূর্তি গড়ে রেখে দিয়েছিলেন, সেটা যে এমন নির্মমভাবে ভেঙে যাবে—এইটেই এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না।

বিশ্বজিৎ, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করল। আত্মগ্লানির লজ্জায় একবার পৌরাণিক সীতার মতো কামনা করলুম, আমার অফিস-ঘরের এই সিমেণ্টের মেজেটা দু ফাঁক হয়ে গিয়ে আমাকে অতলে তলিয়ে নিক। আমি এত দুর্বল হয়ে যাব, এমনভাবে ভয়ের পায়ে নিজের মাথা বিকিয়ে দেব, নিজের এই অধঃপতন আমি কল্পনা করেছিলুম কোনোদিন? দেশের যে-কোনো একজন ঘরকুনো মানুষও ডাক পড়লে অসংকোচে মৃত্যুর সামনে গিয়ে বুক পেতে দিতে পারে, কোনো দিকে তাকায়না—আর আমি, আমি সেই কৃষ্ণা সেনগুপ্ত, বিশ্বজিৎ মল্লিকের স্ত্রী, সত্যের অহঙ্কার যার একমাত্র অলঙ্কার, সামান্য চাকরির মায়াটুকুও আমি কাটাতে পারলুম না?

আমার বাবাকে মনে পড়ল। এই দুর্বলতার খবর যদি সেই সত্যব্রত মানুষটি কোনোদিন পান, তা হলে তিনি জীবনে কোনোদিন আর আমার মুখদর্শনও করবেন না।

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস করো—সব তোমার জন্যে। নিজের কথা বলতে পারি, কারো কাছে ছোট হওয়ার কোনো প্রয়োজন আমার কখনো নেই, কোনোদিন ছিল না। যেদিন থেকে তোমার ব্রতে আমাকে সঁপে দিয়েছি, সেদিন থেকেই নিজের জন্যে এতটুকুও আমি অবশিষ্ট রাখিনি। না—চাকরির ভয় আমার ছিল না—আমি চেয়েছিলুম, তোমাকে বাঁচাব, এই দুঃসময়ে তোমাকে এতটুকু দুঃখ পেতে দেব না। সে জন্যে যে মূল্যই আমাকে দিতে হোক, আমি দ্বিধা করবনা তার জন্যে।

তাই আমি কৃষ্ণা সেনগুপ্ত—না, কৃষ্ণা মল্লিক, আমি বললুম,

ভাবতে হয় বইকি চাকরির কথা। হয়তো জানেন, আমার অনেকগুলো অসুবিধে আছে। তা ছাড়া প্রোপারলি কোয়ালিফায়েড্ নই বলে—

মণিভূষণ এবার নিচের ঠোঁটটাকে একবার কামড়ে ধরলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। সেটা যেন কোনো জ্বলন্ত ফার্নেসের ঢাকনা-খোলা ভাপের মতো এসে আমার মুখ চোখ জ্বালিয়ে দিতে চাইল। আমি মাথা নামালুম—মেজেটা তখন আমাকে নীচের দিকে টানছিল।

—আপনার চাকরি অত সহজে যাবে না—মগের মুল্লুক নয়। যদি সে চেষ্টা ওরা করে, তা হলে স্কুলই উঠে যাবে তার আগে। আপনি কি আমাদের শক্তিকে বিশ্বাস করেন না ?

আমি আর বসতে পারছিলুম না ওঁর সামনে। বললুম, করি বিশ্বাস। কিন্তু রমাপতিকাকাকে আমি কথা দিয়েছিলুম, কোনো রকম পলিটিক্সের ভেতর—

—জানি। কিন্তু আপনি যে সত্যিই—একটা রূঢ় কিছু বোধ হয় মুখে এসেছিল, সেটা সামলে নিয়ে মণিভূষণ বললেন, কিন্তু এতো পলিটিক্স নয়। আপনাদের দাবি।

—আমি—আমি—ভেবে দেখব।

—তাই দেখবেন। ভেবেই দেখবেন।—হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মণিভূষণ। যেন আমাকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। কেবল দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে শেষবার, অতি সংক্ষেপে বিষের সমস্ত তিক্ততা ঢেলে দিয়ে বললেন, আপনাকে একটু আলাদা বলে ভেবেছিলুম। নমস্কার।

বিশ্বজিৎ, আমি টুকরো টুকরো হয়ে গেলুম যেন—সেই মুহূর্তে শুধু একটি কথাই মনে জেগেছিল : আত্মহত্যা করব, আমি আত্মহত্যা করব। কিন্তু—

পারলুম না। পারলুম না তোমারই জন্যে। নিজের সব পরাভব, সব গ্লানিকে ভোলবার জন্যে তোমারই একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে চাইলুম। তুমি বলেছিলে, ট্যাক্‌টিক্‌সেরও দরকার আছে, সময় বুঝে এক পা এগিয়ে তিন পা পেছিয়ে যেতে হয়। তবু জোর পেলুম না, সুর মিলল না। একেই কি পিছিয়ে যাওয়া বলে? হেরে যাওয়া, [illegible]পিছিয়ে শক্তি সঞ্চয় করা কি এক?

না-[illegible]ল-কমিটির মীটিঙে সে-যাত্রা আমার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়নি। কারণ, তারই দিন চারেক আগে মণিভূষণবাবুকে অ্যারেস্ট্‌ করে নিয়ে গিয়েছিল।

বিশ্বজিৎ, সেদিন তোমার পা জড়িয়ে ধরে আমি যে পাগলের মতো ফুলে ফুলে কেঁদেছিলুম, তার কারণ তুমি কল্পনাও করতে পারোনি। দু একবার প্রশ্ন করেছিলে, তারপর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'কী যে তোমাদের মেয়েলি সেন্টিমেন্ট্‌—কোনো অর্থই হয় না।' কিন্তু সেদিন যদি তুমি ঘুণাক্ষরেও জানতে, তোমারই জন্যে তোমার আদর্শকে আমি অপমান করেছি—তা হলে হয়তো লাথি মেরেই আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে।

বিশ্বজিৎ, এ পাপ আমার। সব লজ্জা আমার। তোমারই জন্যে আমি নীলকণ্ঠ। জ্বালায় যত জ্বলব, ততই ভাবব, তোমার জন্যেই আমার এই দুঃখবরণ, এই যন্ত্রণার তপস্যা।

তুমি আমায় ক্ষমা করবেনা, সে আমি জানি।

আমি ঈশ্বর মানি না। যদি মানতুম, তা হলে বলতুম, তিনি সব জানেন, সব বোঝেন, আমার সব অপরাধ তাঁরই ক্ষমায় সার্থক হয়ে যাবে।

তবু তুমিই আমার সম্মান বাঁচিয়েছিলে সেদিন। তুমিই।

তুমি সেই চিরদিনের নাইট-এরান্ট, বিপন্ন নারীকে রক্ষার জন্য যে তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়ে। সেই বীর তুমি, চিরকাল মেয়েরা বরমাল্য গাঁথছে যার জন্যে। সেই কবে এক বর্ষার দিনে, ভিজে শাড়ী গায়ে জড়িয়ে কাতর সেই মেয়েটির সম্মান বাঁচাবার জন্য সিংহের মূর্তি ধরেছিলে তুমি—আর সেই মুহূর্তেই আমার জীবনে তোমার প্রথম সূর্যরেখা পড়েছিল। তুমি জানো না—আজও তেমনিভাবেই লজ্জাহরণ করেছিলে আমার।

মণিভূষণ চলে যাওয়ার পরে কেবল লজ্জা নয়, আতঙ্কেও আমার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে উঠেছিল। এ কী হল? এতো কেবল আমার নিজের কাছে হেরে যাওয়া নয়, আমার আদর্শকে বঞ্চনা করাও নয়! আমি আজ সকলের সামনে কী করুণ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেলুম—যে প্রীতি, যে বিশ্বাস আমার সহকর্মী টীচারদের কাছ থেকে এতদিন আমি পেয়ে আসছিলুম—এবার তা তো ধূলোয় লুটিয়ে যাবে! মণিভূষণ নিশ্চয় উপযাচক হয়ে নিজের কথা বলতে আসেননি, তাঁর পেছনে অন্য টীচারদের সমর্থনও ছিল।

একবার ভাবলুম, ছুটে যাই মণিভূষণের কাছে, তাঁকে বলি—'আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী।' কিন্তু রমাপতি কাকা? পরক্ষণেই ভাবলুম—দিই রেজিগ্‌নেশন, সব মিটে যাক। কিন্তু তুমি? তোমার চিকিৎসা—সেবা—একটুখানি মানসিক শান্তি—

কিছুই করতে পারলুম না! শুধু দুঃস্বপ্নের মতো দিনগুলো কাটতে লাগল। তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না, স্কুলে গিয়ে কারো দিকে চোখ তুলে চাইতে পারি না! মনে হয়, টীচারদের চোখে যেন একটা চাপা কৌতুক ঝকমক করছে, কেউ আড়ালে আর একজনকে ডেকে নিয়ে কথা কইলে সন্দেহ হয়, বুঝি আমাকে নিয়েই কোনো আলোচনা চলছে তাদের।

এরই মধ্যে উমাপতিবাবু একদিন দেখা করতে এলেন। ভয়ে রক্ত আমার শুকিয়ে উঠল। নিশ্চয় মণিভূষণের সঙ্গে আমার কথাবার্তার খবর জেনেছেন, জানতে এসেছেন, আমার মনের গতি কোন্ দিকে।

কী ভাবে যে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম, সে আমি জানি। বারে বারে সেই জুডাস্ ইসক্যারিয়টের কথা মনে পড়ছিল আমার। নরকে গিয়ে তাকে কি আমার চাইতেও বেশি যন্ত্রণায় জ্বলতে হয়েছিল ?

কিন্তু আশ্চর্য, উমাপতিবাবু কোনো কথাই বললেন না ও-সম্পর্কে। নিতান্ত ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন।

—বিশ্বজিৎবাবু কেমন আছেন আজকাল ?

—একটু ভালো।

—তোমার বাবার চিঠি-পত্র পেয়েছ ?

রমাপতিবাবুর বড়ো ভাই, সেই সূত্রে বাবাকে চিনতেন, আমাকে 'তুমি' বলে ডাকতেন।

—কিছুদিন আগে পেয়েছি একখানা।

—ভালো আছেন ?

—হ্যাঁ, ভালোই।—কথার জবাব দিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল, যেন একটা চরম মুহূর্তের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলুম। কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে।

তারপরে উমাপতি একটু চুপ করলেন। বললেন, একটা কথা ভাবছি।

চেয়ারে আমি জমে গেলুম। নিঃশ্বাস থমকে রইল।

উমাপতি বললেন ভেবে দেখছি, তুমি আমাদের বন্ধুর মেয়ে—বলতে গেলে আমাদের মেয়ের মতোই। তোমার সুবিধে অসুবিধের

দিকে আমাদের সব রকম লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারি না। আচ্ছা—উমাপতি সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চাইলেন: এই ছোট বাসায় তোমার কষ্ট হয় না?

—কেন কষ্ট হবে?

—বাসাটা পুরোনো, ঘরও বলতে গেলে খান দেড়েক। আমি বলছিলুম, তোমরা ইচ্ছে করলে আমাদের বাড়ীর একতলায় স্বচ্ছন্দেই গোটা তিনেক ঘর নিয়ে থাকতে পারো।

—না-না জ্যাঠামশাই, আপনাদের অসুবিধে করে—

—অসুবিধে কেন হবে? সবাই-ই তো কলকাতায়। বাড়ী তো পড়েই রয়েছে। চলে এসো না তোমরা। আমি সামনের রবিবারেই বন্দোবস্ত করে দিই।

—এখন থাক জ্যাঠামশাই, দরকার হলে বলব।

—আচ্ছা, বোলো।—উমাপতি জ্যাঠা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। চলে গেলেন তারপরে।

আমি জানি, উমাপতি-রমাপতিরা জমিদার ছিলেন। জানি, অনেক প্রজার রক্ত ওঁদের প্রতিটি টাকার সঙ্গে মাখানো। তবু এই স্নেহ আমাকে উন্মনা করল। জানি, টীচারদের প্রতি অনেক বেশি কর্তব্য ওঁদের আছে, তা ওঁরা পালন করেন না, ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখেন স্বার্থপর মুঠোতে, আজ ইতিহাসের নিয়মেই ওঁদের সরে যাওয়া উচিত। তবু এই ব্যক্তিগত স্নেহ—যাকে বলে পার্সোন্যাল অ্যাটাচ্‌মেণ্ট—তাকে কি এত সহজেই পেরিয়ে যেতে পারি? বিশ্বজিৎ, তোমার যুক্তির ধারায় এইখানেই বোধ হয় মধ্যবিত্ত মনের একটা প্রধান দ্বিধা—এইখানেই সে বার বার নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে। তাই আমি কিছুতেই বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে

পারলুম না, তাই সঙ্গত কারণেও রমাপতি কাকাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আমার মন অত সহজে পিছিয়ে পড়ল।

তুমি পেরেছ, বিশ্বজিৎ। তুমি তো সহজেই ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছ তোমার পরিবারের মধ্যযুগীয় নাগপাশ। আমি পারলুম না। আমি দুর্বল।

কিন্তু যে কথা বলছিলুম। আসলে সেদিন আমার সব লজ্জা হরণ করেছিলে তুমিই।

মণিভূষণ টের পেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে অ্যারেস্ট্ করা হবে। তাই কে দিয়ে গিয়েছিল জানি না, দেখলুম, আমার অফিসের টেবিলে একখানা খাম। তাতে লেখা 'ব্যক্তিগত'।

এতদিন পরে ভালো করে সেই চিঠির সব কথা আমার মনে নেই। কিন্তু সেই চিঠিতে যে বেদনা ছিল, তা আজও আমাকে বেঁধে; এখনো ভুলতে পারি না, কত লজ্জা আর কতখানি গৌরব সেদিন আমি অনুভব করেছিলুম।

তাতে ছিল:

'আমি জানি, অবস্থার বিপাকেই আপনাকে যেমন আশা করেছিলুম সে-ভাবে পেলুম না। কিন্তু এ-ও জানি, আপনি বিশ্বজিৎ মল্লিকের স্ত্রী, আপনি আমাদেরই। আজকের সংকট একটু কেটে যাক, তারপর আমরাও যখন দাঁড়াবার মতো শক্ত মাটি পাব—সেদিন আপনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

আমাকে বোধ হয় শিগ্‌গীরই পাঁচীলের ওপারে যেতে হবে। স্কুলটার উন্নতি চেয়েছিলুম, ওদের চক্র ভাঙতে চেয়েছিলুম, কিন্তু আপাতত কিছুই করা গেল না। ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে। ততদিনে আপনারও কোনো বাধা থাকবে না। আপনিই আমাদের

নেতৃত্ব নিতে পারবেন সহজে—আপনার মধ্যে বিশ্বজিৎ বাবুর আগুন জ্বলছে।

জানিনা, সেদিন মনের জ্বালায় আপনাকে কোনো আঘাত দিয়েছি কিনা। দিয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। আপনি এবং বিশ্বজিৎবাবু আমার নমস্কার নেবেন—মণিভূষণ।'

বিশ্বজিৎ, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার জন্যে সত্যিই আমি তৈরী হচ্ছিলুম।

কিন্তু তুমি? তুমি মণিভূষণকে কী দিলে?

॥ নয় ॥

তবু সে জ্বালাও নিবল। সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু কিছুটা ভুলতে পারলুম বই কি। আবার জীবন চলল। নির্বিঘ্নে—বাঁধা লয়ে। মণিভূষণ তখন জেলে। আমার বিবেকটাকে রক্তাক্ত করবার জন্যে আব কেউই ছিল না। ভেবেছিলুম এইভাবেই চলতে থাকবে।

সেদিন বিকেলে হস্টেলের দিকে চলেছি, পিয়ন এসে একটা পোস্টকার্ড দিলে।

বাবার চিঠি। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি লাইন মাত্র।

কিন্তু সেই কয়েকটা লাইন পড়েই মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। লিখেছেন, 'তিন চার দিন ধরিয়া জ্বরে পড়িয়া আছি। তবে সামান্য অসুখ, কোনো চিন্তা করিও না।'

চিন্তা তাঁর জন্যে কাউকে করতে হয় না। মা-র মৃত্যুর পর থেকে বাবা আশ্চর্য সহিষ্ণু হয়ে গেছেন। নিজের জন্যে কোনো দাবি নেই তাঁর, বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই কারো কাছে। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণাও মুখ বুজে সহ্য করে যান, একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর যখন গায়ে উঠেছে, তখনও বলেন, 'আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না, আমি বেশ আছি।'

শুধু আমি বুঝতে পারতুম। বাবার মুখের দিকে একবার চাইলেই টের পেতুম, কোথায় তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

"কোনো চিন্তা করিও না।" কে চিন্তা করবে? পিসীমা? বাড়ীর সব কাজ দেখাশোনা করে সে সময় কি তাঁর আছে?

একটা ভারী মন নিয়ে হস্টেলে পৌঁছোলুম।

কাজ আরম্ভ করব. তার আগেই বেয়ারা খান কয়েক চিঠি এনে দিলে। মেয়েদের চিঠি। চেক্ করে তবে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। এই নিয়ম।

সবগুলোই মোটামুটি ধরণের চিঠি, মামুলি ব্যাপার, বাবা মা ভাই বোনের কাছ থেকে কুশল সংবাদ প্রার্থনা, বাড়ীর খবর। সাবধানে থাকিও, বাজে মেয়েদের সঙ্গে মিশিওনা। একজনের বান্ধবী নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিল, সে এক দীর্ঘ বিবরণ লিখে পাঠিয়েছে। তাতে অমল বলে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথা লিখেছে, ছেলেটি খুব স্মার্ট আর ভালো গান গায়, তা-ও লিখেছে। অর্থাৎ একটা নাটকের সূত্রপাত। কিন্তু আইনতঃ দোষের কিছু আমি পেলুম না।

কিন্তু এক খানা খাম খুলেই আমার নাক-কান জ্বালা করে উঠল। সরস প্রেমপত্র। পুরো পাঁচ পাতা ধরে। বোঝা গেল, আদৌ এক তরফা নয়। মেয়েটিকে ডেকে পাঠালুম।

ক্লাস নাইনের ছাত্রী, সে তুলনায় বয়স বেশ বেশি। জোর করে ফ্রক পরে এসেছে কিন্তু তাতে আর ওকে কোনোমতেই মানায় না। গোলগাল বোকাটে ধরণের চেহারা, গায়ে কিছু গয়না আছে, শুনেছিলুম অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর মেয়ে।

হাতের চিঠিটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এসে ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়ে রইল উদ্ধত ভঙ্গিতে।

জিজ্ঞেস করলুম, এই বিরহী শিবুটি কে জ্যোৎস্না ?

জ্যোৎস্নার গোল মুখখানা কুঁকড়ে গেল একটুখানি. কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যেই। তার পরেই সরল সোজা গলায় বললে, আপনি আমার চিঠি খুললেন কেন ? দিন্ শিগ্‌গীর।

স্পর্ধা দেখে মাথায় আগুন চড়ে গেল। বললুম, চিঠি খুলেছি

কেন, সে কৈফিয়ৎ তোমায় দেবার আগে জানতে চাই, কে এই শিবু ?

—ও আমার শিবুদা। ওর সঙ্গে আমার 'লাভ' আছে।—তেমনি পরিষ্কার উত্তর এল তার কাছ থেকে।

এমন অশ্লীল, এমন বীভৎস শোনালো ওর কথা যে আমার মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। চিৎকার করে বললুম, স্কুলের হস্টেল ইয়ার্কীর জায়গা ? বখাটে বাঁদর মেয়ে! কালই তোমায় চলে যেতে হবে স্কুল ছেড়ে। তোমার গার্ডিয়ানকেও জানানো হবে সব।

—দিন জানিয়ে।—ঠোঁট উলটে মেয়েটি বললে, আমি তো শিবুদাকে বিয়ে করব। আমার বয়স আঠারো হয়ে গেছে, এখন আর বাবা আমার কী করবে? আর বাবা নিজেও বুড়ো বয়সে কী—

—বেরোও, বেরোও এখান থেকে! এক্ষুণি বেরিয়ে যাও—

হকচকিয়ে ঘর থেকে চলে গেল বটে, কিন্তু ভয় পেলো বলে মনে হল না। ভয় পাওয়ার পাত্রীই সে নয়।

কিন্তু আমার যেন দমবন্ধ হয়ে এল আতঙ্কে। হোক আঠারো বছর, তবু একটা স্কুলের মেয়ের এতখানি সাহস! কোন্ দিকে চলেছে দেশটা? বাড়ীতে অমানুষ বাপের কুশিক্ষা, পাড়াগেঁয়ে বোন-বৌদিদের দুপুরের আসর, হিন্দী ছবির রসালো অভিজ্ঞতা—বয়সের ধর্ম। সব মিলিয়ে কী ভয়ঙ্কর একটা চেহারা! আর বোকা-সোকা চেহারার এই মেয়েটা যে দরকার হলে খুন পর্যন্ত করতেও পারে!

স্তব্ধ হয়ে বসে বসে ভাবছি, এর শেষ কোথায়, কত আবর্জনা সাফ করতে হবে ভবিষ্যতে। বাইরে থেকে জোরালো গলা শোনা গেল। সেই জ্যোৎস্নাই যেন কা'র সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলছে।

—দেবে তাড়িয়ে ? দিক্ না ! ওঃ—ভারী সতী পার্বতী এসেছেন সব ! নিজেরা কলেজে পড়বে, প্রেম ক'রে বিয়ে করবে, আর আমাদের বেলাতেই যত—

চেঁচিয়ে ডাকলুম : জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্না !

আর সাড়া এল না। লক্ষ্যভেদ করে পালিয়েছে ওখান থেকে।

জ্যোৎস্নাকে কালই তাড়াব স্কুল থেকে, হস্টেল থেকে। কিন্তু গায়ের জ্বালা মিটছে না, মাথার ভেতর আগুন জ্বলছে, কাজ-কর্ম কিছুই করতে পারলুম না। দু-তিন ঘণ্টা থ হয়ে বসে থেকে বাসায় ফিরে এলুম।

বাবার অসুখের দুশ্চিন্তা, জ্যোৎস্নার ব্যবহার—সব মিলিয়ে যেমন অসুস্থ, তেমনি উত্তেজিত মন নিয়ে বাসায় পা দিয়েছিলুম। আসতেই তুমি কটু গলায় বললে, রাতটাও হস্টেলে থেকে এলেই পারতে, এত তাড়াতাড়ি ফেরবার কী দরকার ছিল ?

আমি জবাব দিলুম না, দাঁতে দাঁতে চেপে সরে গেলুম। এখন উত্তর দিলেই ঝগড়া হয়ে যাবে। খালি ক্লান্ত. পীড়িত মনটা বলতে লাগল : এভাবে আমি কতদিন চালাব, কতদিন এমন করে পেরে উঠব আমি ? তোমার জন্যে তো আমি সব ছেড়েছি। বাবার ঘর, আত্মীয়-স্বজন, লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট্, সুখ, শান্তি—সব এসেছি বিসর্জন দিয়ে। কিন্তু তুমিও কি একবার চেয়ে দেখবেনা আমার দিকে, শুধু নিজের পাওনা-গণ্ডাটাই ষোলো আনা বুঝে নিতে চাইবে ? তোমার মতো মানুষের কাছ থেকেও সংসারের আরো দশজন স্বার্থপর বৈষয়িক মানুষের দীনতা আমায় প্রত্যাশা করতে হবে ?

তুমি ডাক দিয়ে বললে, এক কাপ চা দেবে অনুগ্রহ করে ?

—দিচ্ছি।

দিলুম চা এনে। হিংস্র বিদ্বিষ্ট চোখে আমার দিকে চাইলে,

আমি মাথা নামিয়ে চলে গেলুম। কিন্তু আমারও মনে জ্বালা জমে উঠছিল তখন।

তুমি খিচুড়ি ভালোবাসো। রাত্রে খিচুড়ি রেঁধে খেতে দিলুম তোমাকে।

একটুখানি মুখে দিয়েই তুমি চিৎকার করে উঠলে : এক ফোঁটা নুন নেই—এ গেলা যায় ?

মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল, ভুল হয়ে থাকবে। আমি কিছু বলতে চাইলুম, তার আগেই তুমি চিৎকার করে উঠলেঃ কী ভেবেছো আমাকে ? ডেড, রট্‌ন—তোমার অনুগ্রহের দাস ? তাই কুকুরে যা খেতে পারে না, তাই গিলতে দিয়েছ আমাকে ?

প্লেটটা ছুঁড়ে দিলে। গিয়ে পড়ল কুয়োতলার ওপর—ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

তখন আমি ধৈর্য হারালুম। সংসারের তুচ্ছতার কাছে হার মানলুম, ইতর হয়ে গেলুম।

বললুম, অত নবাবী মুখ থাকলে নিজেই রেঁধে খেয়ো। আমি তোমার বিনে মাইনের ঝি নই !

—শাট আপ !

—আমাকে চোখ রাঙিয়োনা। সারাদিন খেটে মরছি, মুখে রক্ত উঠছে আমার। তুমি তো বসে বসে সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ছ —কত ধানে কত চাল হয় তা জানো ? তোমার ষাট টাকার মুষ্টি ভিক্ষেয়—

তুমি উঠে গেলে। সোজা শুয়ে পড়লে বিছানায়।

আমিও আর পারছি না—সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। খিচুড়ির প্যানটা নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিলুম কুয়োতলায়, ঢক ঢক করে খানিকটা জল গিললুম খালি পেটে, তারপর বাইরের ঘরের

খালি মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে বাবার জন্যে কাঁদতে কাঁদতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোরে উঠে দেখলুম, তুমি নেই। আর নেই তোমার স্যুটকেস্‌টা।

বিশ্বজিৎ, আমার বলবার কথা শেষ হয়ে এল। কিন্তু এভাবে হঠাৎ শেষ করতে হবে, ভাবিনি। কিংবা হয়তো এমনিই হয়। বাজী তৈরী করবার জন্যে অনেক দিন ধরে মালমশলা জোগাড় করতে হয়, কিন্তু একটা বিস্ফোরণেই তার কয়েক সেকেণ্ডের অভিযান শেষ হয়ে যায়।

আমার এ কাহিনী সেই বাজীর গল্প। কয়েকটা ফুল্‌কি ছড়িয়েই ফুরিয়ে গেল। তবু বাজীর গল্পও নয়। তার শেষটায় তবু আকাশ-ধাঁধানো খানিক আলো থাকে, আমার পালা গৌরবহীন অন্ধকারের মধ্যেই সারা করতে হল।

পরদিন থেকে তোমায় খুঁজতে লাগলুম পাগলের মতো। বাড়ীতে যাওনি, অসীম, নীরদ, কেউ তোমার কোন খবর রাখে না। যেমন হঠাৎ একদিন দেখা দিয়েছিলে, তেমনি হঠাৎ মিইয়ে গেছ বুদ্‌বুদের মতো।

অসীম ভারতবর্ষের সব জায়গায় খোঁজ করেছে চিঠি লিখে। কেউ সংবাদ দিতে পারেনি।

রোজ খবরের কাগজের পাতা উল্‌টে গেছি আতঙ্কে। কে জানে কোথায় পাব আত্মহত্যার খবর। যে সব ডেড-বডি আইডেন্টিফায়েড হয়নি, তাদের দেখবার জন্যে ছুটে গেছি থানায়—হাওড়া স্টেশনে কতকগুলো বিকৃত মৃত্যুর ছবির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। সেখানে তোমাকে পাইনি।

তুমি বেঁচেই আছো। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলুম অল ইণ্ডিয়া

পলিটিক্সে কোথাও নেই। থাকলে নিশ্চয় জানতে পারতুম। তুমি লুকিয়ে থাকবার; আত্মগোপন করবার মানুষ তো নও। আলোর মতো জ্বলে উঠতে, নিজের ছটা ছড়িয়ে দিতে চারদিকে, কাছের সব কিছুকে চকিতে আলো করে তুলতে। বিশ্বজিৎ নাম নিয়ে এসেছ, কারো কাছে হার তুমি মানতে পারো না—যেখানেই যাবে, দেখা দেবে অধিনায়কের ভূমিকায়।

মনে মনে আমি আর একটা স্বপ্ন দেখতুম। অনেক দূরে, ভারত-বর্ষের বাইরে, রাসবিহারী বসু, অবনী মুখার্জি কিংবা নেতাজী সুভাষের মতো কোথাও তুমি প্রস্তুতি নিচ্ছ, শুভ-লগ্নের অপেক্ষায় আছো। তারপর একদিন বজ্র-গর্জনে ফেটে পড়বে, আর সেই প্রলয়-লগ্নে আমি—

ছ-বছর কাটল, তিন, চার, পাঁচ, বছর কেটে গেল।

সেই স্কুলেই আছি। প্রাইভেটে বি-এটা পাশ করেছি অনার্স নিয়ে, কিছু পদোন্নতি হয়েছে। রাজনীতি জীবন থেকে সরে গেছে দূরে। দেশে যে বেপরোয়া উচ্ছ্বাস এসেছিল, যার ধাক্কায় তুমি সরে গিয়েছিলে প্রথম দিকেই—তার জোয়ারটাও দেখলুম। অসীম চার বছর ঘুরে এলো জেল থেকে। মণিভূষণও ফিরলেন, কিন্তু তখন তাঁর অনেক কাজ। চার বছর আগেকার আমার সেই লজ্জার ইতিহাস বোধ হয় ভুলেও গেছেন। শুধু তুমি এখনো ফিরলে না, এখনো বজ্রধ্বনিত আবির্ভাব ঘটলনা তোমার।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতে ইচ্ছে করত আমার। আমি দেখতে পেতুম, বিপ্লবী নায়ক রূপে তুমি এসেছ, মন্ত্রপাঠের মতো চোখ বুজে আমি বলতুম :

‘নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত
এসো মোর ভাঙা আলয়ে,
ললাটে তিলকরেখা
যেন সে বহ্নিলেখা
হস্তে তোমার লৌহ-দণ্ড
বাজিছে লৌহ-বলয়ে,
শূন্যে ফিরিয়া যেয়োনা অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে—’

জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখা করল অসীম।

বললে, বৌদি, বিশ্বজিৎদার কোনো খবর নেই আর ?

—না।

—কোথায় যে গেল—আশ্চর্য !—একটু চুপ করে থেকে বললে, কিন্তু এই সময় ওর ফিরে আসা উচিত ছিল। ও যা ভেবেছিল, তাই তো দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। আমরাই হেরে গেছি।

—জানি না ভাই। আমি কিছু বুঝতে পারি না।—তোমার সেই রুদ্র আবির্ভাবের কথা মনে এসেছিল, কিন্তু অসীমকে সংকোচ হল বলতে। হয়তো আমাকে রোম্যান্টিক্ ভাববে।

অসীম বললে, আবার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হবো ঠিক করেছি।

আমি খুশি হয়ে বললুম, সে তো ভালোই হয়। প্রাইভেটে এম-এ'টা দেব ভেবেছি, একটা নীচের দিকে সেকেণ্ড ক্লাস পেলেও পরের চান্সে হেড মিস্ট্রেস্ হয়ে যেতে পারি। তুমি ভর্তি হলে তোমার বইগুলো পাব, হেল্‌পও পাব।

অসীম বললে, আমার হেল্‌প তোমার দরকার হবে না। তা

ছাড়া তুমি হেড মিস্‌ট্রেস্‌ হবে কেন? এত ভালো ছাত্রী ছিলে তখন, এখন ব্রিলিয়াণ্ট ক্যারিয়ার হতে পারে তো। একটু খেটে পড়লে ফার্স্ট-ক্লাস পাওয়াও অসম্ভব নয়। তখন কলেজ তোমায় লুফে নেবে।

হেসে বললুম, গাছে না উঠতেই এককাঁদি! আচ্ছা আগে তো ভর্তি হও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে, তারপরে দেখা যাবে।

দিন চলে, সময় চলে। তোমার খবর নেই, কোথায় হারিয়ে গেছ কে জানে! কিন্তু সমস্ত দুঃখ, সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যেও আমার আনন্দ আছে একটা। তুমি হারোনি। তোমার কথাটাই সত্যি হয়েছে শেষ পর্যন্ত। জোয়ান অব আর্ককে যারা নির্বোধের মতো একদিন মৃত্যুতে ঠেলে দিয়েছিল আজ তাঁর নামেই তাদের সব চাইতে বড়ো গৌরব। তুমি যে রাজার রাজা, যেখানেই থাকো, রাজার মুকুট জ্বল-জ্বল করছে তোমার মাথায়—সেই রক্তমাখা মুকুট!

বিশ্বজিৎ, তাই নিয়ে আমার জীবনটা কেটে যেতে পারত। সমস্ত জীবন। আমি চরিতার্থ হয়ে থাকতে পারতুম, যদি না কাল অসীম সেই চিঠিটা আমার কাছে নিয়ে আসত।

দু'বছর পরে তোমার চিঠি। অসীমকে লেখা; দামী ব্যাঙ্ক পেপাবের লেটার হেড: 'বি মল্লিক; মার্চেণ্ট।' ঠিকানাটা উত্তর ভারতের এক সুদূর প্রান্তের।

"দূর সম্পর্কের এক মামা সেটল করেছেন এখানে। চলে এসে-ছিলুম তাঁর কাছে। মুখ লুকিয়ে কাটিয়ে দিলুম কিছুকাল, একেবারে স্বেচ্ছায় নির্বাসন।

বুঝতে পারলুম, পলিটিকস্‌ করে লাভ নেই। ও এক ভিশাস্‌ সার্কল। যা দেখলুম, তাতে সব ইল্যুশন ভেঙে গেল।

শুধু একটা কথা ভুলতে পারলুম না। আমার জন্যে কৃষ্ণাকে খেটে মরতে হয়, তার টাকায় খাই, বসে বসে বিড়ি-সিগারেট ওড়াই। এ অপমানও সইতে হবে? সইব পুরুষ মানুষ হয়ে?

মামা টিম্বার মার্চেন্ট। হিমালয়ের পায়ের তলায় উদার বনভূমি তাঁর সোনার খনি। কিছু সাহায্য করলেন, ব্যবসা করতে লাগলুম। বলতে সঙ্কোচ নেই—মোটামুটি কিছু সাক্‌সেস্‌ এসেছে। আমাদের চিরকালের ব্যবসায়ী পরিবার, রক্তের ভেতর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিলই। তাকে জাগিয়ে তুলতে সময় লাগলনা।

কৃষ্ণা সে স্কুলে আছে কিনা জানি না। আর জায়গাটার নাম-ধামও ভুলে গেছি এখন। তাই তাকে চিঠি লিখতে পারলুম না।

সে যদি এখনো আমাকে মনে রেখে থাকে, স্বামী বলে ভাবে, তা হলে তাকে আমি চিঠি লিখব। আমি নিশ্চিত জানি, তোর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছেই।

সামনের মাসেই কলকাতায় আসছি। কৃষ্ণাকে সঙ্গে আনতে চাই। তার স্বামী যে অক্ষম বেকার নয়, সে যে তার স্ত্রীকে অন্তত কিছুটা লাক্‌সারি অ্যাণ্ড কম্‌ফর্ট দিয়ে ভরণ-পোষণ করতে পারে, তাকে এটা জানাতে পারলে তৃপ্তিবোধ করব।”

চিঠির বাকী অংশে কুশল নেওয়া এবং দেওয়া। অসীমের মা-বাবাকে প্রণাম।

অসীম বললে, যাক, এইবার নিশ্চিন্ত হলে তো?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলুম তার দিকে। অসীম বোধ হয় আমার দৃষ্টি সইতে পারলনা, অপরাধীর মতো মাথা নামালো। বললুম, হ্যাঁ ভাই, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

অসীম কী বুঝল জানি না, ওর মুখে যেন একটা ছায়া পড়ল। তারপর বললে, চিঠিটা তোমার কাছে রাখো। আমি ঠিকানা

টুকে রেখে দিয়েছি। তুমি এবার একটা চিঠি দিয়ো বিশ্বজিৎদাকে।

অসীম চলে গেল।

আমার চোখের সামনে চিঠিটা জ্বলছে। কতকগুলো আগুনের হরফ হয়ে জ্বলছে। আমি আর চাইতে পারছিনা ওর দিকে। আমার মনটাকে কাচের পাত্রের মতো ভেঙে কেউ যেন হাজারো টুকরোয় ছড়িয়ে দিয়েছে ওর ভিতরে।

বিশ্বজিৎ, এইবার আমায় পালাতে হবে। তুমি আসবার আগেই পালাতে হবে। ভাবছি, অন্তত তিন মাসের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব যে দিকে চোখ যায়। বাবার কাছে যাওয়ার পথ তো বন্ধ, ত্ব-বছর আগেই তিনি আমাদের মায়া কাটিয়েছেন।

বিশ্বজিৎ, সম্রাটের মূর্তিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে। তুমি পলিটিক্স্ ছেড়েছো বলে নয়—ও নিয়ে তোমার সঙ্গে অসীম তর্ক করবে, আমি নই। কিন্তু একটা অপমানই আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। দেশ গেল, আদর্শ গেল—সে ক্ষতি তোমার কাছে বড়ো হল না; তার চাইতেও তুমি বড়ো করে ভাবলে ওই একটা কথা: "স্ত্রীর অন্নদাস" হওয়ার গ্লানি? সব আদর্শের চাইতে তোমার কাছে সত্য হল একটি মেয়ের কাছে পৌরুষ প্রতিষ্ঠার জেদটাই? আমার কথা ছেড়েই দাও, মণিভূষণদের মতো মানুষের এত শ্রদ্ধা, এত বিশ্বাসের দামও তুমি দিলে না? অধিনায়ক তুমি, তাদের ছেড়ে দিলে পাহাড়ী খাদের শূন্যতার ভেতরে?

বিশ্বজিৎ, তুমি আমায় টেনে তুলতে পারলে না, আমি তোমায় টেনে নামালুম? আমি ছোট হয়ে গিয়েছিলুম, সেই পাপে কি

তোমাকেও স্পর্শ করল রাহুতে? আমার রাজার রাজাকে ভিড়িয়ে দিলুম তুচ্ছতমদের দলে? ছি—ছি, এত বড়ো লজ্জাও আমায় বইতে হবে? আমি তোমার সঙ্গে যাব, তারপর—তারপর—সেই পৌরুষের অভিমানে তুমি যে আরো নীচে নামবে না, কে বলতে পারে সে কথা?

তাই, এবার আমি তোমার জীবন থেকে সত্যিই সরে গেলুম, বিশ্বজিৎ।

চিরদিনের মতো সরে গেলুম।

কিন্তু এ মুক্তি আমার নয়—তোমার।
